স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা।। ১৪ মে - ২০১২।। ৩১ বৈশাখ - ১৪১৯।। দাম : সাত টাকা

অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার প্রধান বিপদ মাওবাদীরা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮
এবার কি দিদি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবেন ? □ ৯
সি পি এমের রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর কারোরই
কৃষক-শ্রমিক ফ্রন্টে কাজের অভিজ্ঞতা নেই □ ১০
সব মুসলমানই কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেয়নি □ এস কে বসু □ ১১
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতির নিয়ম-কানুন □ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১২
লাল-সন্ত্রাস যে কোনও মূল্যে নিকেশ করতেই হবে □ কাঞ্চন গুপ্ত □ ১৪
সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে মাওবাদীদের কাছে মাথা
নোয়াচ্ছে সরকার □ দীনেশ চন্দ্র বাজপেয়ী □ ১৬
দিল্লী দখল করাই মাওবাদীদের লক্ষ্য □ মনমোহন শর্মা □ ১৮
জাড়ার মন্দির □ ডঃ প্রণব রায় □ ২১
জীবন চর্যায় ধ্যান □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২২
শ্রীরামকৃষ্ণের ফলহারিণী কালীপুজো □ অর্ণব নাগ □ ২৩
খোলা চিঠি : আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে চোরের উপদ্রব, শঙ্কিত
সিপিএম নেতারা □ সুন্দর মৌলিক □ ২৭
একই সঙ্গে কীভাবে সমাধান হবে সন্ত্রাসের মোকাবিলা আর
মানবিক অধিকার রক্ষা ? □ ডঃ সুব্রমানিয়াম স্বামী □ ২৮
ডাইনি সন্দেহে খুনের ঘটনা বাড়ছে মালদায় □ ৩০
মুসলিম লীগের পঞ্চম মন্ত্রিত্ব : ইসলামীকরণের পথে কেরল ? □ ৩১
নিজামশাসিত হায়দরাবাদের ভারতে বিলয় : এক অকথিত
কাহিনী □ রাধাকান্ত বিশ্বাস □ ৩২
নিয়মিত বিভাগ
চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □
অঙ্গনা : ২৬ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬ □ □ অন্যরকম : ৩৭ □ □ সুস্বাস্থ্য : ৩৮ □
খেলা : ৩৯□ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ৩১ বৈশাখ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ১৪ মে - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মাওবাদী মোকাবিলায় সরকার
পৃঃ ১৪-১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিশেষ বিষয় :সার্ধশতবর্ষে নটী বিনোদিনী

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তাঁর অবস্থিতি মাত্র ১২ বছরের (১৮৭৪-১৮৮৬)। তবুও সমসময়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর শিরোপা জুটেছিল তাঁর কপালে। সেই সময়ের আগে-পরে নটী বিনোদিনীর চেয়ে ভাল অভিনেত্রী বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে হয়তো এসেছিল, কিন্তু তবুও তিনি অনতিক্রমনীয়, কারণ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপা পেয়েছিলেন। অবিস্মরণীয়া এই প্রথিতযশা শিল্পীর সার্ধশতবর্ষে স্বস্তিকা-র শ্রদ্ধাঞ্জলি। শ্রদ্ধা নিবেদনে — **বিকাশ ভট্টাচার্য ও অর্ণব নাগ।**

সঙ্গে থাকছে অন্যান্য বিষয়ও।

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যেকোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন।

— ব্যবস্থাপক

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাসের মোকাবিলায় চাই জাতীয় নীতি

সুকমা জেলার জেলাশাসক অ্যালেক্স পল মেনন-এর পণবন্দী হওয়ার ঘটনাটি ছত্তিশগড় সরকার যেভাবে মোকাবিলা করিলেন, তাহা প্রশংসিত হইবার যোগ্য। গত ২১ এপ্রিল গ্রামবাসীদের সহিত বৈঠক করিবার সময় মাওবাদীরা শ্রী মেননকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। শ্রী মেননের মুক্তির বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য রমন সিং সরকার খুব দ্রুততার সহিত পাঁচজন সদস্যের একটি রাজনৈতিক কমিটি গঠন এবং সেইসঙ্গে লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য একজন যোগ্য মধ্যস্থতাকারীকে নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে ছত্তিশগড় সরকার আরও একটি কাজ কৌশলে হাসিল করেন। এই অপহরণের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষ যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ—সংবাদমাধ্যমে ইহার ব্যাপক প্রচার করা হয়। ইহার ফলে শ্রী মেনন-কে পণ হিসাবে রাখিয়া দরকষাকষির যে ছক কষা হইয়াছিল, তাহার যৌক্তিকতা লইয়াই মাওবাদীদের মধ্যে সন্দেহ দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত ১২ দিন পর জেলাশাসককে মাওবাদীদের হাত হইতে ছাড়াইয়া আনা হয় এবং এই ব্যাপারে সরকার মাওবাদীদের একটি মাত্র শর্তই স্বীকার করে যে জনজাতিদের বিরুদ্ধে যেসব মামলা চলিতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইবে।

এই ঘটনা হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করিবার আছে। প্রথমত, ছত্তিশগড় সরকার দেখাইয়াছে যে পণবন্দীর মুক্তির জন্য সর্বদা মাওবাদীদের শর্তে রাজী হওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই। পেশাগতভাবে যদি আলোচনা চালাইয়া যাওয়া যায় তবে অনেক কম মূল্যেই কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যায়। দ্বিতীয়ত, দুর্বল অবস্থানে দাঁড়াইয়া রাজ্য সরকার আলোচনা চালাইতেছে— এমন কথা ভাবিবার অবসর যেন মাওবাদীরা না পায়। ছত্তিশগড় প্রশাসন মেননের অপহরণকারীদের কাছে ইহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছিল যে সরকার ততক্ষণ আলোচনা চালাইয়া যাইতে প্রস্তুত যতক্ষণ তাহাদের দাবী যুক্তিসঙ্গত থাকিবে। অন্যদিকে দেখা যাইতেছে, দুইজন ইতালিয়ান পর্যটক ও একজন বিধায়ককে মাওবাদীদের হাত হইতে ছাড়াইয়া আনিবার পরিবর্তে ওড়িশার বিজেডি সরকার ৩০ জন উগ্রপন্থীকে জেল হইতে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছে। সরকারের এই কাজের ফলে শুধু যে ভয়ংকর উগ্রপন্থীরা মুক্তি পাইল তাহাই নয়, তাহাদের অপহরণ করিবার মতো কাজে উৎসাহও দেওয়া হইল।

এই প্রসঙ্গে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং পণবন্দীজনিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় আলোচনা না করিবার যে সর্বসম্মতভাবে নীতির প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা মূল্যবান এবং বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। ইস্রায়েল, রাশিয়া, আমেরিকার মতে কয়েকটি দেশ যে এই নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে তাহা সর্বজনবিদিত। এইরূপ কোনও সর্বসম্মত নীতি যদি স্থির করা না যায়, তাহা হইলে অপহরণকারীরা তাহার পূর্ণ সুযোগ লইবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে, অপহরণ কাণ্ডের মোকাবিলায় নির্দিষ্ট নীতির অভাবে ১৯৯৯-এ আই সি ৮১৪ বিমান অপহরণ কাণ্ডে যাত্রীদের মুক্ত করিবার জন্য তিনজন ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদীকে—যাহাদের মধ্যে জৈশ-ই-মহম্মদের শীর্ষ নেতা মৌলানা মাসুদ আজাহারও ছিল, ভারত সরকার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কয়েকটি উগ্রপন্থী গোষ্ঠী পণবন্দী করিয়া দাবী আদায় করাটাই নিজেদের কার্যপদ্ধতি হিসাবে বেশী পছন্দ করে। তাই পণবন্দী মোকাবিলায় সরকারের নরম মনোভাব কোনও কাঙ্ক্ষিত ফলই প্রদান করিবে না। পণবন্দীদের মুক্ত করিবার ক্ষেত্রে বিশেষ কম্যান্ডো বাহিনীকে কাজে লাগানো একটি ভালো প্রস্তাব। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইল, পণবন্দী সমস্যার মোকাবিলায় নিরাপত্তাবাহিনী ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের তরফে সর্বসম্মত একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

প্রথমতঃ এইটি বুঝিতে হইবে, অসম্ভব আদর্শ ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। অতিমাত্রায় উচ্চ আদর্শ জাতিকে দুর্বল ও হীন করিয়া ফেলে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম-সংস্কারের পর এইটি ঘটিয়াছে। অপর দিকে আবার অতিমাত্রায় 'কাজের লোক' হওয়াও ভুল। যদি এতটুকুও কল্পনাশক্তি তোমার না থাকে, যদি তোমাকে নিয়মিত করিবার একটা আদর্শ না থাকে, তবে তুমি তো একটা পশুমাত্র। অতএব আমাদিগকে আদর্শও খাটো করিলে চলিবে না, আবার যেন আমরা কর্মকেও অবহেলা না করি। এই দুইটি 'অত্যন্ত'কে ছাড়িতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

পাকিস্তানে হিন্দু নারীদের নির্যাতন নিয়ে আলোচনা হোক সংসদে : বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশে হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার নিয়ে সংসদের দুই কক্ষেই আলোচনার দাবীতে সোচ্চার হয়েছে বিজেপি। বিজেপির প্রবীণ নেতা ও সাংসদ ড. মুরলীমনোহর যোশী লোকসভায় বিষয়টি উত্থাপন করে বলেছেন, ইসলামি দেশে হিন্দু নারীদের উপর নির্যাতন এবং তাদের জোর করে ধর্মান্তরকরণ গভীর উদ্বেগের। মানবাধিকার ভঙ্গের এক চূড়ান্ত নজির। ভাগলপুরের সাংসদ সৈয়দ শাহনাওয়াজ হুসেনও দলের সংসদীয় বৈঠকে পাকিস্তানে হিন্দু নারীদের নির্যাতন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

পাকিস্তানে হিন্দুদের সংখ্যা ব্যাপকহারে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানে জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ ছিল হিন্দু। আজ হিন্দুদের সংখ্যা সেদেশে ২ শতাংশে পৌঁছেছে বলে ড. যোশী জানান। পাকিস্তানে হিন্দুরা শুধু অযথা হয়রানিরই মুখোমুখি হচ্ছে না, তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও মানবাধিকারও প্রকাশ্যেই হনন করা হচ্ছে। সম্প্রতি দলের সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান এল কে আদবানীও সংসদে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন। যদি তামিলদের অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য শ্রীলঙ্কায় সংসদীয় দল যেতে পারে তবে পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থা নিয়ে সংসদের দুই কক্ষে আলোচনা হবে না কেন বলে বিজেপি প্রশ্ন তুলেছে।

উল্লেখ্য, মাস দুয়েক আগে পাকিস্তান থেকে একদল হিন্দু পালিয়ে এসেছে এবং দিল্লীর যন্তর-মন্তরের কাছে কোনওরকমে মাথা গুঁজে রয়েছে। তারা ভারত সরকারের কাছ থেকে নিজেদের শরণার্থী হিসেবে উল্লেখ করে ত্রাণসামগ্রী সাহায্য চেয়েছে এবং ভারতীয় নাগরিকত্বও দাবী করেছে।

গিনিস বুকে সোনালী আচার্য
২৫ ঘন্টা ২৫ মিনিটের ম্যারাথন রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্য

ননস্টপ পঁচিশ ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট ২৫ জনের দল সহ নাচ করে গিনিস বুকে (গিনিস বুক অফ্ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস্) নাম তুলে ফেললেন অসমের বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দির মেয়ে তথা হায়দরাবাদ প্রবাসী সোনালি আচার্যি। সোনালি বিয়ের পর থেকেই হারদরাবাদবাসী। গত ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি গিনিস প্রতিনিধিদের সামনেই তিনি হায়দরাবাদের রবীন্দ্র ভারতী হলে নৃত্য প্রদর্শন করে হাতে হাতে সার্টিফিকেট বা প্রমাণপত্রও পেয়ে যান। এখন অসম জুড়ে সোনালির সংবর্ধনা চলছে। হায়দরাবাদে গত ১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৫-৪৫-এ অনুষ্ঠান শুরু হয়ে পরদিন সন্ধ্যা ৭-১০ মিনিটে শেষ হয়।

অসমের সেচমন্ত্রী অর্ধেন্দু কুমার দে বলেছেন, সোনালি শুধুমাত্র অসমের নয় সারা দেশেরই গর্ব। তাঁকে উৎসাহ ও সমর্থন যুগিয়ে যাওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। নোবেলজয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চারটি নৃত্যনাট্য তাঁরা মঞ্চস্থ করেছিলেন— ''চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা এবং ভানুসিংহের পদাবলী।'' পুরো অনুষ্ঠানের কোরিওগ্রাফার সোনালি নিজেই। নৃত্যের সঙ্গে সাতটি ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রসঙ্গীতও পরিবেশন করা হয়। সোনালি বলেছেন, ''আমি মূল চরিত্রে অভিনয় করলেও আমার সহশিল্পীরা সবাই মিলে সাহায্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের ১৫০ বছর পূর্তিতে একটি অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলাম আমরা। গিনিস কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের সহযোগিতায় যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়।''

পঁচিশজন সহশিল্পী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, কেরল এবং অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে। একইসঙ্গে ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার শিল্পীরাও সোনালির দলে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে এক সার্থক ও ব্যতিক্রমী উপস্থাপন বলে সংবাদসংস্থা জানিয়েছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

পাকিস্তানে স্কুল-পাঠ্যে ভারত-বিরোধিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পাকিস্তান স্কুল পাঠ্যসূচীতে 'জেহাদ' সম্বন্ধে সুর কিছুটা নরম করলেও কোনওরকম রাখ-ঢাক না করেই 'হিন্দু বিরোধিতা ও ভারত বিরোধিতা' পুরোমাত্রায় চালিয়ে যাচ্ছে। এটাই্ তাদের জাতীয় নীতি। পাকিস্তানের 'জিন্না ইনস্টিটিউট'-এর প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে একথা জানা গিয়েছে। আমেরিকার চাপ এবং চেষ্টার ফলে 'জেহাদ' এবং অমুসলমানদের উপর মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক অনেক কথাবার্তাই পাঠ্যসূচী থেকে বাদ পড়েছে। যেমন— "জিম সে জেহাদ এবং কফ থেকে কাফির।" তবে 'জেহাদ' ইসলামের মূল নীতিগুলির অন্যতম এবং জেহাদের অনেক প্রকার আছে— এভাবেই ব্যাখ্যা করে সরাসরি জেহাদের নির্দেশ না দিয়ে সুর নরম করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সরাসরি হিংসায় উস্কানির বদলে 'শহীদ' হওয়াকে মহিমামণ্ডিত করা হয়েছে।

পাঠ্য পুস্তকের "নজরিয়া-এ-পাকিস্তান" শীর্ষক অধ্যায়ে ঘুরিয়ে- ফিরিয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছে। উপরোক্ত জিন্না ইনস্টিটিউটের প্রধান হলেন শেরি রহমান। তিনি পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের জাতীয় নিরাপত্তা সমিতির সদস্য এবং আগে মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, সিলেবাসের রদবদল যথাযথভাবে করা হয়নি।

উদাহরণ হিসেবে অষ্টম শ্রেণীর সিলেবাসের একটি অধ্যায়ে আছে, "হিন্দুদের-বিশ্বাস হলো 'ভারতীয় উপমহাদেশে' কেবলমাত্র হিন্দুজাতিই বসবাস করতে পারবে। অন্যান্যরা 'হিন্দু জাতি'র (Nation) অংশ হিসেবে থাকবে অথবা তাদেরকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আর্য সমাজের মতো অনেক হিন্দু উগ্রপন্থী দল কাজ করে চলেছে। এমনকী পাকিস্তান সৃষ্টির ৫০ বছর বাদেও ওই সব দল এলাকা থেকে মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে চায়।"

নবম ও দশম শ্রেণীর টেক্সট্ বইয়ে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দোষারোপ করে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু বিদ্রোহীদের মদত দিয়ে 'বাংলাদেশ'- এর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন।

সিন্ধ টেক্সট্‌বুক বোর্ডের অষ্টম শ্রেণীর উর্দু বইয়েও ইসলামী জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব এবং ভারতবিরোধী কথাবার্তায় ভর্তি রয়েছে। এভাবেই পাকিস্তানে স্কুলস্তর থেকে ভারত-বিরোধী পাঠ পড়িয়ে মগজধোলাই করা হচ্ছে।

ভারত তৃতীয় গোমাংস রপ্তানীকারক দেশ হতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের ২৪টি রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হলেও ২০১২-১৩ আর্থিক বর্ষে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গো-মাংস রপ্তানীকারক দেশ হিসাবে উঠে আসছে। আমেরিকাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে ব্রাজিল ও অস্ট্রেলিয়ার পরই ভারত স্থান করে নিচ্ছে। ২০১২-র প্রথম পর্বে ভারত ১.২৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের গো-মাংস রপ্তানী করেছে। ২০১০-এ এই রপ্তানী বাবদ রাজস্ব আয়ে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। সম্প্রতি 'ইউ এস বীফ এক্সপোর্ট ফেডারেশন স্টাডি' সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। এযাবৎ মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির বাজারে মহিষের মাংসের চাহিদা ছিল। সম্প্রতি আরব দেশগুলিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে হঠাৎ করেই গোমাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে গোরুকে মাতৃভাবে দেখা হয়। এই দেশের সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে গোরু। গোরু শুধু দুধ যুগিয়ে শরীরকে শক্তিশালী নয়, জ্বালানি ও জৈব সারও যোগান দেয়। সাম্প্রতিককালে গোমূত্র থেকে নানারকম ওযুধও তৈরি হচ্ছে।

শুধু সংস্কৃতি নয় ভারতীয় অর্থনীতিতেও গোরুর অবদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভারতীয়দের জীবনের সঙ্গে গোরু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ কারণেই এদেশের অধিকাংশ রাজ্যেই গো-হত্যা নিষিদ্ধ। দিল্লী ও রাজস্থানে গো-হত্যা তো বটেই, গো-মাংস বিক্রিও নিষিদ্ধ। কঠোর আইনের ফলে লাভজনক এই ব্যবস্থা এখন তাই গোপনে চলছে। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে ১৫ লক্ষ গোরু (১.৫ মিলিয়ন) যার মূল্য দাঁড়াবে ৫০০ মিলিয়ন ডলার, প্রতি বছর ভারত থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই চোরা পাচারের ৫০ শতাংশের বেশী গোমাংস ভোগ করে শুধু প্রতিবেশী বাংলাদেশই।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

কলকাতা দূতাবাসে ‘অদৃশ্য’ হামলার অভিযোগ চীনের, মতলবে সন্দিহান পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ চীনের কলকাতাস্থিত দূতাবাসে বার বার তিব্বতিরা গোলমাল পাকাচ্ছে বলে বিদেশ মন্ত্রকের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে চীন। সল্টলেকে তাদের দূতাবাসটি বছর পাঁচেক হলো স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এনিয়ে দু'বার সিরিয়াস অভিযোগ তুলল চীন। তাদের যুক্তি হলো, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দূতাবাসে যথেষ্ট নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। তাই তিব্বত আন্দোলনকারীরা দূতাবাসের আশপাশে নানা বিরুদ্ধ প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও পুলিশ, গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির অনেকেই মনে করছেন, চীন যে সব অভিযোগ করছে তার কোনও ভিত্তি নেই। আরও নিরাপত্তা পেতেই হয়তো নিজেরাই দূতাবাসের দেওয়ালে স্বাধীন তিব্বতের পোস্টার মেরে গোল বাধাচ্ছে। কারণ, সল্টলেক বা আশেপাশে তিব্বত আন্দোলনকারীদের নামগন্ধ নেই। চীন যে সব অভিযোগ করছে, কখনও কেউ তা চোখে দেখেনি। তাই চীনের পদক্ষেপকে সন্দেহের চোখেই দেখছে এরাজ্যের নিরাপত্তা এজেন্সিগুলি। তাঁদের মনে প্রশ্ন, রাজ্য তথা দেশকে হেয় করতে এসব ওদেরই কারসাজি নয়তো?

সম্প্রতি চীনের নয়াদিল্লীর দূতাবাস থেকে বিদেশ মন্ত্রককে অভিযোগ দায়ের করে বলা হয়,

কলকাতার বিধাননগরে চীনা কনস্যুলেট জেনারেলের অফিস

কলকাতার দূতাবাসের পাঁচিলে কেউ বা কারা ‘ফ্রি টিবেট’ লেখা পোস্টার সেঁটে দিয়ে গিয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক বিষয়টি দেখার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পাঠিয়েছিল। তারপর দিল্লী থেকে মহাকরণে নির্দেশিকা পাঠিয়ে বলা হয়েছে, চীনের দূতাবাসের নিরাপত্তা বাড়াতে হবে। মারাত্মক অভিযোগ আর যেন না ওঠে।

এর আগে ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিক শুরুর সময় চীন একই অভিযোগ করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, কোনও এক রাতে তৎকালীন চীনের কনসাল জেনারেলের গাড়িটি ভেঙে দিয়ে গিয়েছে কেউ। সম্ভবত তিব্বত আন্দোলনকারীরাই এমন কাজ করেছে। তা নিয়ে হইচই শুরু হয়। উত্তর ২৪ পরগণা পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে। সেই তদন্তের কাজে অগ্রগতি না হওয়ায় চীনের তরফ থেকে ফের অভিযোগ করা হয়। রাজ্য সরকার সি আই ডি'কে ঘটনার তদন্ত করতে পাঠিয়েছিল। তখনই সি আই ডি কর্তাদের মনে হয়েছে, কনসাল জেনারেলের বাড়ির গ্যারাজে ঢুকে গাড়ির কাচ ভাঙার কাজ তিব্বতিরা করতে যাবে কেন?

তিব্বত আন্দোলনকারীরা যদি চীনের বিরুদ্ধে কোনও বিষোদ্গার করতে চায়, তাহলে প্রকাশ্যেই করবে। তাতে অন্তত প্রচার পাওয়া যাবে। অযথা আতঙ্ক তৈরি করা তো তাদের কাজ নয়। দেশে কোথাও এমন ঘটনা ঘটেনি বলে অতীতের রেকর্ড ঘেঁটে জানতে পারেন গোয়েন্দারা। তাঁদের মনে হতে থাকে, তাহলে চীন নিজেই এমন ঘটনা ঘটিয়ে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢিলেঢালা বলে দেখাতে চাইছে না তো? তিব্বত ইস্যুটি জিইয়ে রেখে রাজনীতি করাই ওদের লক্ষ্য নয় তো? যদিও এসব প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর মেলা ভার। ফলে সি আই ডি-র তদন্তও আর বেশিদূর এগোয়নি।

ফের দূতাবাসের পাঁচিলে এমন দেওয়াল লিখনের কথা থাকায় নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির সন্দেহ হচ্ছে। প্রশ্ন, তিব্বতিরা কেন রাতের অন্ধকারে দেওয়াল লিখন করে যাবে। পোস্টার লাগিয়ে যাবে। ফলে এরমধ্যেও অন্যকিছুর গন্ধ পাচ্ছে তারা। তবে চীনের অভিযোগের ভিত্তিতে দূতাবাসের নিরাপত্তা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সমাজ তথা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবিক গুণের বিকাশের যে প্রশিক্ষণ তা-ই সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ বলে উল্লেখ করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত। গত ৬ মে হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, এই লক্ষ্যেই স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত বর্ষ জন্মজয়ন্তীতে সঙ্ঘ দশ হাজার যুবকের তিন দিনের শিবির করবে। স্বামী বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর কাছে ধনসম্পত্তির বদলে জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক- বৈরাগ্য চেয়েছিলেন। সেই গুণ বিকাশের জন্য এবং স্বামীজীর প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদানের লক্ষ্যে এই শিবির ২০১৩ সালের ১১-১৩ জানুয়ারি হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এবারের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ১৯৩ জন স্কুল-কলেজের ছাত্র অংশগ্রহণ করেন। শিবিরের বর্গাধিকারী হিসাবে উপস্থিত থাকছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং বর্গ কার্যবাহ হিসাবে রয়েছেন নরসিংহ ঘোষ। আগামী ২৬ মে পর্যন্ত চলবে এই শিবির। রোজ ভোর ৩-৪৫ থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চলবে শারীরিক কসরতের পাশাপাশি বৈঠক, বৌদ্ধিক চর্চা।

এবার কি দিদি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবেন?

গূঢ়পুরুষের কলম

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের কাছে অর্থ সাহায্য চাইতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কর্ম-ব্যস্ততার অজুহাতে মমতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রথমদিন বাতিল করেন। এবং তার পরেরদিন মমতার সঙ্গে কথা বললেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবি নিয়ে নির্বাক থাকেন। দিল্লীর ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে যাঁরা খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা জানেন প্রধানমন্ত্রীর দৈনিক 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' অনেক আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা থাকে। যে কেউ হুট্‌হাট করে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে ঢুকে বৈঠকে বসে যেতে পারে না। সাধারণভাবে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে না পড়লে প্রধানমন্ত্রীর দৈনন্দিন কর্মসূচি বাতিল হয় না। গত ৪ মে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মমতার সাক্ষাৎকার অনেক আগেই স্থির করা ছিল। সেইমতই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী পৌঁছে যান। দিল্লী পৌঁছে তিনি জানতে পারেন প্রধানমন্ত্রী পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখো করতে পারবেন না। জোর দিয়ে বলতে পারি, ব্যস্ততার অজুহাতে 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' বাতিল করাটা পুরোপুরি অসৌজন্য। পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে, 'ওহে দিদি, তুমি তোমার রাজ্যে যত বড় নেত্রী হও না কেন দিল্লীতে আমরা তোমাকে আলাদা গুরুত্ব দিই না।' অর্থাৎ তুমি কাঙাল হয়ে আমার দুয়ারে ভিক্ষা চাইতে এসেছো। ভাল কথা। কাঙাল মুখ্যমন্ত্রীদের লাইনে গিয়ে দাঁড়াও। সময় হলে তোমার প্রার্থনা শোনা যাবে। হ্যাঁ, ঠিক এইভাবে দিল্লীতে কংগ্রেস নেতৃত্ব অসৌজন্যমূলকভাবে মমতাকে বার্তা দিয়েছে। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করবেন সেটাই দেখার। দিল্লী যে হাত উপুড় করবে না তা এখন স্পষ্ট। সেক্ষেত্রে আর্থিক দেউলিয়া অবস্থা থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে 'দিদি' কোন পথে চলবেন তা জানতে আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। আশা করা যায়, ২০ মে মা-মাটি-মানুষের সরকারের প্রথম বর্ষ পূর্তি উৎসবের দিন তিনি পথ বাতলাবেন।

দিদি বলেছেন, তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবেন। ইতিমধ্যেই তিনি অ-কংগ্রেসী এবং অ-বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে লাল সিপিএম তাঁর কাছে 'অচ্ছুৎ' হলেও, জাতীয় রাজনীতিতে নয়। কেন্দ্র-বিরোধী আন্দোলনে তিনি ত্রিপুরার সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী মানিক

সরকারের সহযোগিতা চান। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের চোহারাটা কেমন হবে এখনই বোঝা যাচ্ছে না। কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন করলে নেত্রী স্ববিরোধিতায় পড়বেন। কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁর দলেরই একাধিক মন্ত্রী আছেন। দলীয় মন্ত্রীদের পদত্যাগ না করিয়ে কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন করলে নিজের দলের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করা হয় সেই ছোট্ট কথাটা নিশ্চয় দিদির অজানা নয়। অন্যদিকে, ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া তাঁর ভাইয়েরা মন্ত্রিত্ব খুইয়ে আন্দোলনে নামতে চাইবেন না তা রাজ্যবাসী জানেন। নিতান্ত বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর 'কুরশি' ছাড়লেও পরে শোধ নেবেন। প্রথম সুযোগেই দিদির পিঠে ছুরি চালাবেন। তাই কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন করার হুমকি দেওয়াটা সহজ। কিন্তু বাস্তবে তা' করে দেখানোটা সহজ নয়।

সামনেই রাজ্যে ছয়টি পুরসভার নির্বাচন। এই নির্বাচনে তৃণমূল এবং কংগ্রেস পৃথকভাবে লড়বে। অর্থাৎ, সেই অতি চেনা রাজনীতির ছক। বাম বিরোধী ভোট ভেস্তে দাও। গণিতের সরল নিয়মেই সিপিএম ক্ষমতায় ফিরবে। অনেক আশা নিয়ে রাজ্যবাসী সিপিএমকে তাড়াতে 'পরিবর্তন' চেয়েছিলেন। সেই 'পরিবর্তন' এতটা তাড়াতাড়ি মুখ থুবড়ে পড়বে কেউই ভাবতে পারেননি। পরিবর্তনের কাণ্ডারী ভাবছেন মুসলিম ব্লক ভোট তাঁর দলকে জেতাবে। একদা সিপিএম দলও তাই ভাবতো। এই রাজ্যে কংগ্রেসও ক্ষমতায় থাকার সময় তোষণ নীতি অনুসরণ করতো। বাংলাদেশের জন্মের পর কোটি কোটি বাংলাদেশীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কোনও দলেরই সরকার অনুপ্রবেশ বন্ধে সামান্যতম চেষ্টা করেনি। সব দলেরই উদ্দেশ্য ছিল বা আছে একটাই। কয়েক কোটি বাংলাদেশী মুসলিমের ভোট পাওয়া। কত কোটি বাংলাদেশী মুসলিম এই রাজ্যে বাস করছে তার সঠিক তথ্য রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের জানা নেই। সরকারিভাবে বলা হয় পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম ভোটদাতার সংখ্যা ২৬ শতাংশ। কিন্তু বাস্তবে তাই কী? এই সংখ্যাটা ৩৫ শতাংশ হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। একটা কথা মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গে রেশনকার্ডধারীদের সংখ্যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার সরকারি হিসাবের থেকে অনেক অনেক বেশি। এর কারণ, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন সব রাজনৈতিক দলের মদতে সহজেই রেশনকার্ড, ভোটার কার্ড পেয়ে যায়। সত্যিকারের পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে রেশনকার্ড, ভোটার কার্ড পাওয়াটা মোটেই সহজ নয়। আসন্ন ছয়টি পুরসভার নির্বাচনে বাংলাদেশী মুসলিম ভোটারদের সমর্থনে তৃণমূল কতটা সফল হয় সেটাই দেখার।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর কারোরই কৃষক-শ্রমিক ফ্রন্টে কাজের অভিজ্ঞতা নেই

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

'পাউডার মাখা নেতারা বিপ্লব করবে? কালো চুলের চাষীর ছেলেদের কাজে নামাতে হবে। হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরবে। এঁদের জন্যেই এই অবস্থা— সবাই জানে।'

এটা চাষীর বেটা তথা সিপিএমের প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাক-এর বক্তব্যের কিছু উদ্ধৃতি। তিনি আরও বলেছেন, 'কৃষক নেতারা ক্ষেতে নামেন না।' রেজ্জাক নাকি শরীর ভাল থাকলে ক্ষেতে কাজ করেন। রেজ্জাকের বক্তব্যকে অনেকেই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ হিসেবে দেখাচ্ছেন। হয়তো কিছুটা সত্যি। কিন্তু এটাও সত্যি সিপিএমের রাজ্য-সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে কারুরই কৃষক ফ্রন্ট-শ্রমিক ফ্রন্টের কাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। শ্যামল চক্রবর্তী বিদ্যুৎকর্মীদের ইউনিয়ন-এ যুক্ত থেকে সিটুর নেতা হয়েছেন। অবশ্য রাজ্য সিটুর আর এক নেতা কালী ঘোষ তো বেহালায় মিউনিসিপ্যাল কর্মীদের ইউনিয়ন করতেন। সিপিএমের রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর বাকি সদস্যগণ এসেছেন ছাত্র-যুব ফ্রন্ট থেকে। মহম্মদ সেলিমকে গরীব-নিচের তলার মুসলমানরা কখনই কাছের মানুষ হিসেবে মেনে নেবেন না।

দীর্ঘ ৩৪ বছরে শ্রমিক অঞ্চলে পার্টি ট্রেড ইউনিয়ন-এর বিস্তার হয়নি। পোর্ট-ডক-খিদিরপুর জেসপ ডানলপ-জুট- কয়লা-ইস্পাত-কাশীপুর-ইছাপুর গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরি প্রভৃতি শিল্পে এই বক্তৃতাবাজ নেতারা হাতে কলমে কাজে নামছেন না কেন? আসলে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে বিমান-বুদ্ধ বনাম বর্ধমান গোষ্ঠীর লড়াই-এর দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ঠিক করা হচ্ছে। মদন ঘোষকে কাউন্টার করার জন্যই বিমান বসু মুর্শিদাবাদের নৃপেন চৌধুরীকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আনলেন। নিজের গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করার জন্য দীপক দাশগুপ্তকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে উন্নীত করা হলো। দীপক দাশগুপ্ত ছাত্রফ্রন্ট থেকে হাওড়ার জেলা-সম্পাদক হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মেদিনীপুর-এর পার্টির 'তদারকি'তে ব্যর্থ হয়েছেন। যতক্ষণ দীপক সরকার থাকবেন ততক্ষণ দীপক দাশগুপ্ত মেদিনীপুরে দাঁত ফোটাতে পারবেন না। সিপিএমের কেন্দ্রীয় রাজ্য নেতৃত্ব বারবার মুখস্থ করা বুলির মতো বলছেন— 'নবীনদের নেতৃত্বে আনো।' আদতে এটা কথার কথা মাত্র।

যদিও অমিতাভ নন্দীর গোষ্ঠীকে সরানোর জন্য গৌতম দেব জেলা- সম্পাদকমণ্ডলীতে পলাশ দাশ, তন্ময় ভট্টাচার্য, সোমনাথ ভট্টাচার্য ও সব্যসাচী কর (প্রয়াত ননী করের পুত্র)-কে সম্পাদকমণ্ডলী এনেছেন। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে এক সময়ে একটি প্রথা চালু ছিল। তা হলো পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ব্রাঞ্চস্তরে গিয়ে ব্রাঞ্চের অধীনে সাধারণ কর্মী হিসাবে তিনমাস কাজ করতে হোত। এ-প্রথা সিপিএম নেতৃত্ব মোটেই চালু করবেন না, কারণ নেতারা ক্ষমতালোভী। নেতারা শুধু পার্টি সংগঠনের সভায় ভাষণ দেন।

একথা সত্য যে কমিউনিস্ট পার্টিতে চিরদিনই 'বিলেত ফেরত' নেতাদের রমরমা। কমিউনিস্ট পার্টি শুধু ইংরাজি লেখা-পড়াতে পটুরাই নেতা হয়েছেন। প্রকাশ কারাত ও সীতারাম ইয়েচুরি তো জে এন ইউতে ছাত্র-আন্দোলন করেই নেতা। অবশ্যই এঁরা নাম্বুদ্রিপাদ, সুরজিৎ-এর কাছে কাজ করে হাত পাকিয়েছেন।

সিপিএমের রাজ্য-সেক্রেটারিয়েট-এর সদস্য সংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে পার্টির কাজকর্ম সঙ্কুচিত হচ্ছে। এই গোষ্ঠীবাদী ক্ষমতালোভী নেতারা পার্টিকে দাঁড় করাতে পারবেন না। আর তা হওয়ারও নয়। কারণ কলকাতা তো নরেন সেন-কে আজীবনের নেতা করে রেখেছিল। কলকাতায় দলাদলির চূড়ান্ত করেছিলেন লক্ষ্মী সেন অ্যান্ড কোং। এখন লড়াই রাজদেও গোয়ালার সঙ্গে বিরোধী গোষ্ঠীর।

এই নেতাদের নিয়ে সিপিএমের উঠে দাঁড়ানো সুদূরপরাহত। তাইতো মাও-জে-দং বলতেন, 'সদর দফতরে কামান দাগো।' এই সদর দফতর হলো পার্টির সদর দফতর।

ক'দিন আগে ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ন্যান্সি পাওয়েল মমতার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। এই ন্যান্সি পাওয়েল এক সময়ে আমাদের দেশে ডেপুটি কনস্যাল জেনারেল ছিলেন। জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব বাবুদেরও মার্কিন নেতারা দেখা-সাক্ষাত করে 'মাপার' চেষ্টা করেছিলেন। মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টন কলকাতায় মমতার সঙ্গে দেখা করে ঘুরে গেলেন। হিলারি ক্লিনটনের বিদায় আসন্ন। তিস্তাচুক্তির ব্যাপারে মমতাকে 'চাপ' দেওয়া হচ্ছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। মার্কিন দেশের নেতৃত্ব জমি অধিগ্রহণ থেকে খুচরা বিপণনে বিদেশীদের অবাধ বিনিয়োগের বিচরণের ব্যবস্থা চাইছে। এর জন বিল পাশ ত্বরান্বিত করতে তারা কি মমতাকে চাপ দেবে না?

> **কমিউনিস্ট পার্টিতে চিরদিনই 'বিলেত ফেরত' নেতাদের রমরমা। কমিউনিস্ট পার্টি শুধু ইংরাজি লেখা-পড়াতে পটুরাই নেতা হয়েছেন। প্রকাশ কারাত ও সীতারাম ইয়েচুরি তো জে এন ইউতে ছাত্র-আন্দোলন করেই নেতা।**

সব মুসলমানই কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেয়নি

এস কে বসু

গত মে মাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের নেতারা ও মসজিদের ইমামরা কেউ ছয় দফা কেউ দশ দফা কেউ বা ২১ দফা সাম্প্রদায়িক দাবী-দাওয়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলে চলেছেন যে বামফ্রন্ট মুসলিম সমস্যা সমাধানের জন্য নাকি কিছুই করেনি। সে কারণে মুসলিমরা তাঁদের ভোট দেননি বলে বামফ্রন্টকে চলে যেতে হয়েছে। আর তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন বলে তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন। সেই সঙ্গে হুমকি দিয়ে চলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ৩ জন ভোটারের এক জন মুসলমান। অতএব সাধু সাবধান। তাঁদের আকাশ ছোঁয়া সব সাম্প্রদায়িক দাবী-দাওয়া না মানলে মমতাকেও চলে যেতে হবে।

কিন্তু তাঁদের দাবী অনুসারে সব মুসলমান কি তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে? এ দাবী আদৌ সত্য নয়। প্রথমেই ধরা যাক মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরের কথা। এই তিন মুসলিম অধ্যুষিত জেলায় পশ্চিমবঙ্গের সিংহভাগ অন্তত ৬০ শতাংশ মুসলিমের বাস। এর মধ্যে এক মুর্শিদাবাদেই ২৬টি আসন। এর কয়টি তৃণমূল পেয়েছে? হাতে গোণা ৩/৪টি। সব মিলে এই তিন মুসলিম অধ্যুষিত জেলায় ১০/১২টির বেশি হবে না যা তৃণমূলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যার (১৮৫) তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তারপর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা। এই মুসলিম অধ্যুষিত জেলায় তৃণমূল অনেক আসন পেলেও এখানে ক্যানিং, সন্দেশখালি, হাসনাবাদ, বসিরহাট, দেগঙ্গা, ভাঙ্গর ইত্যাদি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বামফ্রন্ট জয়ী হয়েছে। রেজ্জাক মোল্লাকে কি মুসলিমরা ভোট দিয়ে জেতায়নি? সুতরাং মুসলিমদের ভোটে তৃণমূল জয়ী হয়েছে এ কথা আদৌ সত্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ হিন্দু, এক চতুর্থাংশ মুসলিম— এক তৃতীয়াংশ নয়। স্বাভাবিকভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া যায়— এই তিন চতুর্থাংশ ভোটে তৃণমূল জয়ী হয়েছে, শুধু মুসলমান ভোটে নয়। সুতরাং এইসব মুসলিম নেতা ও ইমামদের সাম্প্রদায়িক হুমকিতে কান দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

এতো গেল একদিক। অন্যদিকে হারলেও বামফ্রন্ট ৪১ শতাংশ ভোট পেয়েছে, এর সব হিন্দু ভোট নয়— এই ৪১ শতাংশ-এর অন্তত ১৫ শতাংশ মুসলিম ভোট তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর বামফ্রন্ট মুসলিমদের জন্য কিছুই করেনি এ কথা আদৌ ঠিক নয়। এই

সোজা-সাপ্টা

ইমাম-ভাতা

বামফ্রন্টের আমলে সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য চাকুরী সংরক্ষণ, পৃথক সংখ্যালঘু সেল, অজস্র মাদ্রাসা তৈরি ও তার সরকারি স্বীকৃতি, একাধিক মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন যার মধ্যে মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িকতা তথা দেশবিভাগের সূতিকাগার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্থাপনও রয়েছে, একাধিক হজ হাউস নির্মাণ, হজ যাত্রার ভরতুকি, মুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা হস্টেল, মুসলিমদের জন্য আলাদা কলোনী (হয়ে জাতীয় সংহতি!), মুসলিম ছাত্রদের দরাজ হাতে গ্রান্ট, ব্যবসা করার জন্য মুসলিমদের ঢালাও ঋণের ব্যবস্থা, সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়ন (তালিবান রাজত্বের আর বাকী রইল কি) ইত্যাদি সবই হয়েছে। অর্থাৎ বামফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গ সেমি-পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। তৃণমূলের আমলে তা আরও দ্রুত বেগে পূর্ণ পাকিস্তান হতে চলেছে যার সর্বশেষ উদাহরণ উর্দুকে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি ও হাজার হাজার ইমামদের মোটা টাকার মাসিক প্রদান (পুরোহিতদের নয় কেন?) এবং শুধু মুসলিমদের জন্য কল্পতরু হয়ে দরাজ হাতে অজস্র আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি ও জেলায় জেলায় সংখ্যালঘু ভবন নির্মাণ (সংখ্যাগুরু ভবন নয় কেন? তারা কি অপরাধ করল? তারা কি ভোট দেয়নি? শুধু মুসলিম ভোটে তৃণমূল জিতেছে?)। এইখানে এই পশ্চিমবঙ্গে যতদিন যাচ্ছে হিন্দুদের এক সন্তান পরিবার আঁকড়ে ধরার ফলে তত হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত ও হিন্দু সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ওদিকে মুসলিম জনসংখ্যা ও সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু তাতেও এই সব মুসলিম নেতারা ও ইমামরা সন্তুষ্ট নন। তাঁরা এখনই পশ্চিমবঙ্গকে পুরোদস্তুর পাকিস্তানে পরিণত করার জন্য নিয়ম করে কখনও ৬ দফা, কখনও ১৬ দফা, কখনও বা ২১ দফা সাম্প্রদায়িক দাবী-দাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন। শীঘ্রই এইসব দাবীর দফা হাজারে পৌঁছোলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের চরম দুর্ভাগ্য যে মুসলিম ভোট পাওয়ার আশায় এখানকার সরকারি, বিরোধী সব দলই বিন্দুমাত্র প্রশ্ন না তুলে মুসলিমদের এইসব সাম্প্রদায়িক দাবী-দাওয়া 'তথাস্তু' বলে মেনে নিয়ে চলেছেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বহু কষ্টে অবিভক্ত বাংলার যে ক্ষুদ্রাংশটুকু বাংলায় হিন্দুদের বসবাসের জন্য মুসলীম লীগ তথা জিন্নার কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন তা ধীরে ধীরে কিন্তু আবার মুসলিম শাসনে চলে যাচ্ছে। এর থেকে সর্বনাশের ও দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতির নিয়ম-কানুন

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন আসন্ন বলে এই পদের নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার।

সংবিধান রচয়িতারা নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করতে চাননি। তাঁদের লক্ষ্য ছিল দুটো—

১. এই নির্বাচনে অঙ্গরাজ্যগুলোর সমহারে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা; এবং

২. রাজ্য বিধানসভাগুলোর ভোট সংখ্যার সঙ্গে সংসদের প্রদেয় ভোটসংখ্যার একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা।

এই দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা সংবিধানের ৫৫নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনপদ্ধতি নির্ধারিত করেছেন। বলা বাহুল্য, তার ফলে একটা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়েছে। মনে হয়, ব্যবস্থাটা এর চেয়ে সহজ করার উপায় ছিল না।

এই নির্বাচন পদ্ধতিটা তিনটে পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়—

ভোট মুখ্য নির্ধারণ

প্রথমে নির্ধারণ করতে হয় বিধায়কদের ভোট মূল্য। তাঁরা অবশ্যই একটা করে ভোট দেবেন— কিন্তু তার মূল্য নির্ধারণ করার একটা পদ্ধতি রয়েছে।

প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যাকে সেই রাজ্যের বিধায়ক-সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। সেই ভাগফলকে ১০০০ দিয়ে আবার ভাগ করতে হয়। ভাগশেষ যদি ৫০০ বা তার বেশি হয়, তাহলে পূর্বোক্ত ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করতে হবে। এটাই হবে প্রত্যেক বিধায়কের ভোট মূল্য।

ধরা যাক, একটা রাজ্যের জনসংখ্যা ৪০০০০০০০ (৪ কোটি) এবং বিধায়কের সংখ্যা ২০০। সেক্ষেত্রে প্রথম ভাগফল হবে ২০০০০০ (২ লক্ষ)। একে ভাগ করতে হবে ১০০০ দিয়ে। এবার ভাগফল হবে ২০০। ভাগশেষ যেই সেটা ৫০০ বা তার বেশি হলে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক বিধায়কের ভোট মূল্য হবে ২০০। এভাবে বিভিন্ন বিধানসভার সদস্যদের ভোট মূল্য যোগ করতে হবে।

সাংসদদের ভোট মূল্য নির্ণয়ের পদ্ধতিটা ভিন্ন ধরনের। বিধানসভাগুলোর ভোট মূল্যকে সংসদের দুই কক্ষের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা

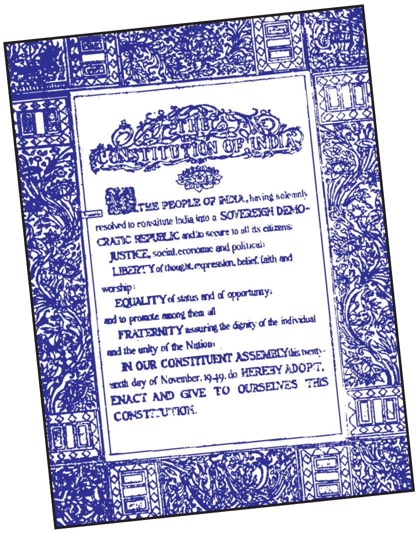
THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষ যদি ভাজকের অর্ধেক বা তার বেশি হয়, তাহলে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করতে হবে। সেটাই হবে সাংসদদের ভোট মূল্য।

ধরা যাক বিধায়কদের মোট ভোট মূল্য ৪০০০০০ (৪ লক্ষ) এবং নির্বাচিত সাংসদের সংখ্যা ৪০০। তাহলে তাঁদের প্রত্যেকের ভোট মূল্য হবে ১০০০।

ভোটদান

এরপর আসে ভোটদানের পালা।

এক্ষেত্রে একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি গৃহীত হয়েছে। এই নীতি অনুসারে যতজন প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, ভোটাররা ততগুলো পছন্দ (preference) জানাতে পারেন। অর্থাৎ ভোটাররা প্রার্থীদের নামের পাশে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে তাঁদের পছন্দটা জানাবেন। প্রত্যেক ভোটারকে তাঁর প্রথম পছন্দটা জানাতেই হবে, তা না হলে তাঁর ব্যালট বাতিল হয়ে যাবে।

ভোটের ফলাফল মূলত নির্ভর করে প্রথম পছন্দের ভোট নিয়েই। এভাবে ভোট গ্রহণের পর প্রার্থীর প্রথম পছন্দের ভোটগুলো যোগ করা হয় এবং তার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় ‘কোটা’।

‘কোটা’

প্রথম পছন্দের সব ভোটকে যোগ করে ২ দিয়ে ভাগ করে তার সঙ্গে ১ যোগ করলে পাওয়া যাবে ‘কোটা’। রাষ্ট্রপতিকে এই কোটা পেতেই হবে।

ধরা যাক প্রথম পছন্দের মোট ভোট পড়েছে ১০,০০০। তাহলে ১০,০০০÷২+১ হলে কোটা— এক্ষেত্রে সেটা ৫০০১। ধরে নিচ্ছি ভোট পড়েছে এভাবে—

প্রার্থী	প্রথম পছন্দের ভোট
ক	৪৫০০
খ	৩৫০০
গ	২০০০

এক্ষেত্রে কেউই কোটা পাননি। সুতরাং গ-কে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দিয়ে তাঁর ব্যালটের ক এবং খ-এর দ্বিতীয় পছন্দের ভোট পদের প্রথম পছন্দের ভোটের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। ধরে নিই— সেটা যথাক্রমে ৫৫০ ও ৩০০। এক্ষেত্রে ক-এর কোটা হবে (৪৫০০+৫৫০) বা ৫০৫০। সুতরাং তিনিই হবেন রাষ্ট্রপতি। প্রসঙ্গত বলা দরকার— ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ছাড়া দ্বিতীয় পছন্দের ভোটের দরকার হয়নি। ভি ভি গিরি, সঞ্জীব রেড্ডী ও সি ডি দেশমুখের মধ্যে কেউই ‘কোটা’ পাননি। ফলে দ্বিতীয় পছন্দের ভোট যোগ করতে হয়েছিল এবং তাতে ভি ভি গিরি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

উপসংহার

গণপরিষদ অবশ্যই একটা জটিল নির্বাচন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করেছে। সদস্যদের কেউ কেউ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ডঃ বি সি রাউত লিখেছেন, গরিষ্ঠরা ইচ্ছে করেই ('deliberately') বর্তমান পদ্ধতিটা

গ্রহণ করেছেন পূর্বোক্ত কারণে (ডেমোক্রাটিক কনস্টিটিউশান অফ্ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১১২)

অবশ্যই তার ফলে প্রক্রিয়াটা হয়ে গেছে বেশ জটিল। ডঃ হরিহর লবক্ষের ভাষায়— ‘complicated method’---(ইন্ডিয়া : ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ: ১৬৭)। ড: এম ভি পাইলী এটাকে ‘a unique system’ বলে অভিহিত করেছেন নানা কারণে। তাঁর মতে, এর মধ্যে রয়েছে বাস্তবতা--- (অ্যাব্ ইনট্রোডাকশন টু দ্য কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ: ১৫৭)।

> **সংবিধান রচয়িতারা চেয়েছিলেন জনসাধারণের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকুক এই নির্বাচনে। কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ক্ষমতায় এলে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতো প্রকৃত শাসক হতে চাইবেন। অথচ এই ক্ষেত্রে জনতানারায়ণকে জড়িত করার কথা রচয়িতারা ভুলতে পারেননি। এই কারণে তাঁরা সংসদ ও বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোটের ব্যাপারে রেখেছেন— যাঁরা জনসাধারণের ভোটেই নির্বাচিত প্রতিনিধি।**

তিনি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। এবং সংবিধান রচয়িতারা চেয়েছিলেন জনসাধারণের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকুক এই নির্বাচনে। কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ক্ষমতায় এলে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতো প্রকৃত শাসক হতে চাইবেন। অথচ এই ক্ষেত্রে জনতানারায়ণকে জড়িত করার কথা রচয়িতারা ভুলতে পারেননি। এই কারণে তাঁরা সংসদ ও বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোটের ব্যাপারে রেখেছেন— যাঁরা জনসাধারণের ভোটেই নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁদের ভোটের অর্থ হলো পরোক্ষভাবে জনসাধারণেরই ভোট। এভাবেই সংবিধান রচয়িতারা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করেছেন। এস এল সিক্রি মন্তব্য করেছেন, ‘It is tantamount to direct election. It makes the President the choice of the nation and not of particular party or constituency।’ তাছাড়া প্রত্যক্ষ নির্বাচন হলে খরচও অনেক বেশি হোত—(ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ: ৮৫)।

সব মিলিয়ে বলা যায়— ব্যবস্থাটা বেশ বিজ্ঞজনোচিতই হয়েছে। বিশেষ করে বলা দরকার— এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলোও একটা উপযুক্ত মর্যাদা পেয়েছে (দুর্গাদাস বসু--- ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ: ১৪৩)। পদ্ধতিটা জটিল, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো

বাংলা ভাষায় এই প্রথম জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গাঁধিজীর সম্পূর্ণ জীবনী
রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের

মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী

একটি অকপট জীবনী, ১৫০

পোরবন্দর থেকে শুরু হওয়া গাঁধিজীর জীবন শেষ হয়েছিল রাজঘাটে। নানা বৈপরীত্যে ভরা ছিল সেই জীবন; সেই সব বৈপরীত্য নিয়েই রচিত এই ঐতিহাসিক জীবনী যা আপনাকে দ্রুতলয়ে টেনে নিয়ে যাবে শুরু থেকে শেষে। কোনও জীবনই একহারা নয়, প্রতিটি জীবনেই আছে নানা টানাপোড়েন, আপনি পৌঁছবেন এই সত্যে।

তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, M-9830532858

লাল-সন্ত্রাস যে কোনও মূল্যে নিকেশ করতেই হবে

কাঞ্চন গুপ্ত

দু'চার দিন আগে দক্ষিণ দিল্লীর একটি টেলিভিশন বিতর্কে আমি অংশ নিয়েছিলাম। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত কিছু বক্তা মাওবাদী সন্ত্রাস সম্পর্কে কেমন একটা আড়ো-আড়ো, ছাড়-ছাড় ভাব দেখাতে লাগলেন। বক্তব্য— প্রতি বক্তব্য ও তাঁদের ধারণা সবাইকে গলাধঃকরণ করাতে গিয়ে এমন একটা অবস্থান নিলেন যাতে মনে হবে এ ব্যাপারে তাঁদের মতো প্রগাঢ় পণ্ডিত বোধহয় আর কেউ নেই। অথচ সত্যি কথা বলতে কী, তাঁদের মতামতের সারমর্ম ছিল গর্দভের (asi-nine) গর্জন। এই মহাপণ্ডিতদের একজন ছিলেন অধ্যাপক হরগোপাল যিনি দেশব্যাপী যে ধ্বংস লুঠ ও গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে মাওবাদীরা, তার জন্য মাওবাদীদের দায়ী করাটাকেই অস্বীকার করতে চান। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী এই ধ্বংসোন্মাদ মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করা হোক। দরকার-মাওবাদীদের ওপর নৈতিক চাপ আর সরকারের ওপর আইনী চাপ। ''মাওবাদীরা কোনওকালেই অপহরণের মতো কোনও কাজে জড়িত নয়''— এমন একটি কেবল উন্মাদের পক্ষে শোভাকর দাবীও তিনি রাখেন। এ থেকে একটা জিনিস বোঝা যায় যে হয় তিনি প্রকৃত সত্য কিছুই জানেন না, না হলে তিনি এমন কিছু চেপে যেতে চাইছেন যা প্রকাশ পেলে তিনি যাদের আড়াল করতে চান তারা ফেঁসে যাবে। আর এই ফেঁসে যাওয়া লোকেরাই আসলে একটু অন্য ধরনের সন্ত্রাসবাদী।

আলোচনাকারীদের মধ্যে থেকে আর একজন বলতে চাইলেন মাওবাদীদেরকে কখনও জিহাদীদের সঙ্গে এক পঙতিতে ফেলা চলে না। বলা বাহুল্য, অংশগ্রহণকারীদের অনেকে অধ্যাপক হরগোপাল শুরুতেই যে নিকৃষ্ট আধা-উন্মাদের ধারণাটি চাউর করতে চেয়েছিলেন সেটিরই সমর্থনে গলা ফাটান। মাওবাদীদের নৃশংস কাণ্ডগুলিকে তাঁরা খুবই হাল্কা চালে নিয়ে পক্ষান্তরে প্রশ্রয়দাতার ভূমিকা নেন। অনায়াসে ভুলে যান নিরীহ মানুষ খুনের পেছনে যে আদর্শই থাকুক না কেন তা আদতে খুনই। বাস্তবে মাওবাদী আর জিহাদীদের মধ্যে প্রভেদ করতে যাওয়া বাতুলতারই নামান্তর। এক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ অজয় সাহানী যেমন বলেছেন 'গেটিং ফিল্ড বাই এ মাওইস্ট বুলেট ইজ অ্যাজ ব্যাড অ্যাজ গেটিং ফিল্ড বাই জিহাদী বুলেট'। তবে এসব অকাট্য যুক্তি আমরা কাদের বোঝাব? যারা দেওয়ালের লিখন পড়তে নারাজ, নির্দয় খুনীদের 'বন্দুকধারী, গান্ধীবাদী' নামে ডাকার নতুন বিলাসিতা ধরেছে তাঁদের। সেদিনের আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে বিতর্ক চালাতে সত্যিই বিতৃষ্ণা জাগছিল। হায়! তিস্তা শীতলবাদ ঘরানার জীবদের কি ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তিগ্রাহ্য কিছু বোঝানো যাবে? কাঁকের পাগলা গারদ খুলে দিলে হয়তো তাঁরা বিতর্কসভায় কিছু সমমনস্ক দোসর পাবেন!

মধ্যস্থতাকারী হরগোপাল

অবশ্য অতীতের অধিকাংশ আপস-আলোচনাতেই মাওবাদীরা এই হরগোপালকেই মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পছন্দ করেছে। কারণটা বোঝা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওড়িশা সরকার উপযুক্ত দৃঢ়তা দেখালেও হরগোপাল তাঁর অসার মনোভাব নিয়ে মাওবাদীদেরই পক্ষাবলম্বন করেছেন। সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে কালেক্টর জনপ্রতিনিধি নিরীহ নাগরিক কাকে না অপহরণ করছে মাওবাদীরা! অপহরণ আজকাল মাওবাদীদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ঠিক যেমন তারা অভ্যস্ত হয়েছে জনজাতি, উপজাতিদের আতঙ্কগ্রস্ত করার, স্কুলবাড়ী, স্বাস্থ্যকেন্দ্র অকাতরে ধ্বংস করায়। নিত্যদিন টেলিকম্যুনিকেশনের টাওয়ার ওড়ানো তাদের প্রিয় খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তারক্ষীদের ঢালাও খুন রুটিনে পরিণত হয়েছে। এর চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে নারী কমরেডদের নিয়ে তথাকথিত আদর্শবাদী বিপ্লবীদের অকৃপণ যৌন ক্রীড়ায়। 'বিপ্লবী'রা বীভৎস যৌন কামনা চরিতার্থ করতে মহিলা কমরেডদের যৌনদাসী বানিয়ে অকল্পনীয় ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে। এরাই নিরীহ মানুষ মেরে তাদের এই বিকৃত ব্যবস্থাকে কায়েম করতে বদ্ধপরিকর।

সরকারী হিসেব নিকেশ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই লাল সন্ত্রাসবাদীরা আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তার কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। গত চার বছরে মাওবাদীরা ১৫৫৪ জনকে অপহরণ করেছে। নির্দিষ্ট মামলায় বিচারাধীন কয়েকজন মাওবাদীদের মুক্তির বিনিময়ে অপহৃতরা কেউ কেউ ছাড়া পেয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি নগদ টাকায় লেনদেন হয়েছে। অপহরণের পর ৩২৮ জনকে মেরে ফেলা হয়েছে। অবশ্য খুনের আগে তাদের জন আদালত (Kangaroo Court) নামে একটি বিচার প্রহসনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গত বছরে ওড়িশার মালকানগিরি জেলার কালেক্টর R. Vineet krishna-র অপহরণ এরকমই একটি। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক জেলে থাকা বিচারাধীন কিছু মাওবাদী বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে শ্রী কৃষ্ণেরও মুক্তি নিশ্চিত করেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে দিব্যা ওরফে ওয়ালাসি নামের এক মাওবাদী এরিয়া কমান্ডার যে বিনীত কৃষ্ণের অপহরণে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল সম্প্রতি সে ধরা পড়েছে। এই দিব্যা অন্ধ্র-ওড়িশা সীমান্তে বালিখেলা অঞ্চল পেরোবার সময় ৩৬ জন পুলিশকর্মীর খুনে সক্রিয় অংশ নেয়।

সর্বশেষ পরিস্থিতি

মাওবাদীরা ছত্তিশগড়ের সুকমার জেলা কালেক্টর অ্যালেক্স পল মেননকে অপহরণ করে তাদের ডেরায় নিয়ে গেছে। তামিলনাড়ু ক্যাডারের এই আই এ এস অফিসারের গাড়ি আক্রমণ করে মাওবাদীরা তাঁর দুই দেহরক্ষীকে খুন করে মেননকে তুলে নিয়ে যায়। দীর্ঘ অনিশ্চয়তায় ৩২ দিন কাটানোর পর গত ২৬ এপ্রিল ছাড়া পেয়েছেন ওড়িশার লক্ষীপুরের বিধায়ক ঝিনা হিকাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিকাকা একজন অতি জনপ্রিয় উপজাতি নেতা। অবশ্য তাঁরও বিচার জনআদালতে হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে তাঁর মুক্তির শর্তগুলি এখনও পরিষ্কার নয়।

লক্ষণীয়, প্রত্যেকদিনই মাওবাদীরা বাড়তি শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। আমাদের দুর্বলচিত্ততার সরকারের দোদুল্যমানতার সুযোগ তারা শতকরা ১০০ ভাগ নিচ্ছে। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধ ঘোষণার বদলে কর্তৃপক্ষ এখনও হাত কচলে ভাবছেন এতে ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাব্য হিসেব কিরকম? একটি সাবধানী মহল থেকে শোনা যাচ্ছে আরও ধৈর্য ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখন সরাসরি প্রতি আক্রমণে গেলে আরও বেশি সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মীর জীবনহানি হতে পারে। কথাটি লোক ভোলানো। নিরাপত্তাকর্মীরা আমাদের রাষ্ট্র, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে বা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লে তাকে রক্ষা করতে দায়বদ্ধ। এ যুদ্ধে প্রাণহানি হবে। রক্ত ঝরবে। বলা দরকার, এ কথার মানে এই নয় যে আমাদের নিরাপত্তারক্ষীদের জীবনের কোনও দাম নেই। কিংবা হিংস্র চরমপন্থীদের আক্রমণের মুখে তাদের অনায়াসেই বলির পাঁঠা করা যেতে পারে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে অতীতে ভারতের সংহতি ও একতা যখনই বিপন্ন হয়েছে তা থেকে সফল উত্তরণ সবসময়ই নিরাপত্তারক্ষী ও সাধারণ নাগরিক বনাম রাষ্ট্রদ্রোহীদের পরস্পরবিরোধী রক্তপাতের রাস্তাতেই হয়েছে।

> **ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে অতীতে ভারতের সংহতি ও একতা যখনই বিপন্ন হয়েছে তা থেকে সফল উত্তরণ সবসময়ই নিরাপত্তারক্ষী ও সাধারণ নাগরিক বনাম রাষ্ট্রদ্রোহীদের পরস্পরবিরোধী রক্তপাতের রাস্তাতেই হয়েছে।**

রাষ্ট্রদ্রোহীদের দমন

দেশের মানুষের স্মৃতিশক্তি ঐতিহাসিক ভাবে দুর্বল হওয়ায় অনেকে ভুলেই গেলাম উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্রোহীদের দমন করে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বা পাঞ্জাবের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী খালিস্থানী ধ্বংসলীলা বন্ধ করে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে দেশকে কী ভয়ঙ্কর মূল্যই না চোকাতে হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরে টগবগে তরুণ সেনা অফিসার বা অসংখ্য সাধারণ জওয়ান আতঙ্কবাদীদের সঙ্গে মহড়া নিতে গিয়ে বা নিয়ন্ত্রণ রেখার উল্টো দিক থেকে আসা 'জিহাদী' আক্রমণ রুখতে তাদের উষ্ণ রক্ত ঢেলে চলেছে।

চোখের জল যদি আমাদের সত্যিই ফেলতে হয় তাহলে তা সঞ্চিত রাখতে হবে যারা তাদের উর্দির সম্মান রক্ষা করে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করছে। আমাদের সংকল্প নিতে হবে যে তাদের জীবনদান যেন ব্যর্থ না হয়। পাই পাই হিসেব বুঝে নিতে হবে সেই সব হিংসার কারবারীদের থেকে। যারা তাদের বিকৃত আদর্শবাদের অজুহাতে নির্বিচারে কেড়ে নিচ্ছে বীর নিরাপত্তারক্ষীদের জীবন ও নিরীহ নাগরিকদের বাঁচার অধিকার। এখানে বলার কথা হলো— নিরাপত্তারক্ষীই হোক আর সাধারণ নাগরিকই হোক, তাদের হঠাৎ করে মৃত্যুর প্রতিশোধস্পৃহায় তেড়ে-ফুঁড়ে মাওবাদীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে বা অন্যদিকে করছি করব, গয়ংগচ্ছর মতো গাড়োলবৃত্তি— দু'টোর কোনটাই কিন্তু ফল দেবে না। সরকারকে এগোতে হবে অতি সন্তর্পণে। নির্দিষ্ট ছক তৈরি করা যাতে সরকার কি করতে চায় সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অস্বচ্ছতা যেন না থাকে। নিচ্ছিদ্র কৌশলের মাধ্যমে নিরাপত্তারক্ষীরা যাতে প্রতিপদে মাওবাদীদের বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে তা দেখতেই হবে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের ভুল হবে, ফাঁক-ফোকর থেকে যাবে। কিন্তু এই লাল সন্ত্রাসের মোকাবিলায় যারা সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন, পরিকল্পনা কৌশল বাতলাচ্ছেন, তাঁদের প্রতি-বিদ্রোহী (Counter Insurgency) রণকৌশলের যে পূর্ব-অভিজ্ঞতা দেশের সৈন্য ও নিরাপত্তা বাহিনীর রয়েছে তা থেকে শিক্ষা, সাহায্য নিয়েই নিজেদের তৈরি করতে হবে। এই ব্যবস্থাটা কর্মক্ষম ও আঘাত হানবার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে মনে করলেই সরকার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, যাতে আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে এক পলপট অনুসৃত স্বৈরাচারী রাষ্ট্র নির্মাণের হিংস্র কৌশলে যারা লিপ্ত তারা যেন চিরতরে স্তব্ধ হয়। স্বাধীনতা ভোগ করতে হলে তার মূল্য চোকাতেই হবে। সে দাম যত চড়াই হোক না কেন আমাদের মুখ ফেরানোর রাস্তা নেই।

(লেখক একজন বিশিষ্ট স্তম্ভ লেখক)

সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে মাওবাদীদের কাছে মাথা নোয়াচ্ছে সরকার

দীনেশ চন্দ্র বাজপেয়ী

গত ১৬ মার্চ রাজধানী নতুন দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা এবং মাওবাদ উদ্ভূত বিপত্তি বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ রণনীতি গৃহীত হবে— এটা আশা করা হয়েছিল। সেই নীতির ফলে মাওবাদী সন্ত্রাস দমন করার বিষয়ে প্রভাবশালী ও কার্যকর পদ্ধতি সত্বর নেওয়া হবে— ধরে নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের আচার- ব্যবহারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁরা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা তথা জনসাধারণ ও সরকারি কর্মীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার থেকে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতি বিষয়েই বেশি করে আগ্রহী। এমনকী এই চূড়ান্ত সঙ্কটের সময়েও সমস্যার সমাধানে তাঁদের সদিচ্ছা দেখা গেল না। একারণেই মাওবাদী সন্ত্রাস আজ এতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। যে সকল রাজ্য সরকার নিজ নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে অর্থাৎ প্রাথমিক কর্তব্য পালনে ব্যর্থ, সুপ্রীম কোর্টের আদেশ সত্ত্বেও পুলিশ বাহিনীতে সংস্কার করে না; উপরন্তু তারাই পুলিশকে দুর্নীতি ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে অপব্যবহার করে, যারা বারবার মাওবাদীদের সামনে হাঁটুগেড়ে আত্মসমর্পণ করতে কোনওরকম লজ্জা-শরম অনুভব করে না, তারাই রাজ্যের অধিকারের জন্য গলা ফুলিয়ে চিৎকার করতে পিছপা হয় না।

একদিকে রাজ্য সরকারগুলো আরও বেশি বেশি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইছে আবার অন্যদিকে রাজ্যে সন্ত্রাসবিরোধী কেন্দ্র খুলতে বিরোধিতা করছে স্রেফ্ রাজনৈতিক কারণে। বছরের পর বছর মাওবাদী-নকশালবাদীদের প্রভাব বৃদ্ধির কারণই হলো রাজ্য সরকারের সন্ত্রাসদমন অভিযানে পরস্পর বোঝাপড়ার অভাব, যৌথবাহিনীর যৌথ অভিযান চালাতে পরস্পর সহযোগিতার অভাব এবং সর্বোপরি কেন্দ্র ও রাজ্য— দুইয়ের গোয়েন্দা বিভাগের মধ্যেও সমন্বয়ের অভাব। যে মাওবাদী সন্ত্রাসকে বিগত কয়েকবছর যাবৎ দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেই দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবথেকে বড় বিপদ বলে বারবার উল্লেখ করে আসছেন সে ব্যাপারেও আমাদের রাজনৈতিক নেতারা একমত হয়ে কাজ করতে পারছেন না। এই সংকীর্ণ মানসিকতার জন্যই দেশের সাধারণ মানুষ লাগাতার মাও-সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন আর দেশের এক বিশাল এলাকা সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে।

ওই ১৬ মার্চের বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করে নিয়েছেন যে, দিন দিন নিরাপত্তাবাহিনীর উপরে মাওবাদীদের হামলা আগের তুলনায় অনেক সুপরিকল্পিত, সুব্যবস্থিত এবং অধিক পরিমাণে হিংসাত্মক হয়ে উঠছে। নতুন নতুন রাজ্যেও তাদের প্রভাব বাড়ছে— যেমন, অসম, মণিপুর এবং অরুণাচল। নকশাল প্রভাবিত এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনী প্রভাবহীন হচ্ছে এবং কোনও বড় সাফল্য অর্জন করতে পারছে না। তিনি আরও বলেছেন, এই গরীব

বিগত তিন বছরে মাওবাদীরা ১৮২৯ জন নাগরিক এবং ৭৭৫ জন নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যকে হত্যা করেছে। ওড়িশার তিরিশটি জেলার মধ্যে কুড়িটাই মাওবাদী প্রভাবিত, ঝাড়খণ্ডে ২৪টির মধ্যে ১০টি, ছত্তিশগড়ে ২৭টির মধ্যে ১৫টি এবং বিহারে ৩৮টি জেলার মধ্যে ৩০টাই মাওবাদী- নকশাল প্রভাবিত।

সরকার কেন উন্নয়নের ছবি তুলে ধরতে পারছে না যেখানে সকলের অংশগ্রহণ এবং সর্বসমাবেশক স্বরূপ দেখা যায়? গরীব মানুষ উন্নয়নের বিরোধী নয়। তবে সরকারকেও তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। উন্নয়নের সুফল সর্বত্র পৌঁছানো এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছানো জরুরী।

ও পশ্চাৎপদ এলাকায় যত দ্রুত উন্নয়ন প্রয়োজন ছিল তাও হচ্ছে না। নেই প্রয়োজন অনুসারে থানা, পুলিশ, অস্ত্রশস্ত্র এবং বাহন প্রভৃতি। মৌলিক পরিকাঠামোও বেশ পুরনো— না আছে রাস্তা, না আছে প্রশাসন। অর্থাৎ প্রত্যেক অর্থবছরে পুলিশের আধুনিকীকরণ, এলাকার উন্নয়ন, উপজাতিদের উন্নয়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য প্রদত্ত বিশাল পরিমাণ অর্থ দুর্নীতি ও অপশাসনের কারণে নষ্ট হয়েছে। নেতারা জনগণকে রাজনীতির নেশায় বুঁদ করে রেখেছে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের কারণেই এটা হয়েছে।

এবছর প্রথম দু'মাসে মাওবাদীরা ৩১ জন নিরাপত্তাকর্মীকে হত্যা করেছে, গত বছর মাওদের হাতে মারা গিয়েছিল দশ জন। গত ২৭ মার্চ মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলিতে মাওবাদীরা ১৫ জন সি আর পি এফ জওয়ানকে হত্যা করেছে। মহারাষ্ট্রে গত ২০১০-এ ৪৫ জনকে হত্যা করেছিল, ২০১১-তে ৫১ জনকে হত্যা করেছে। মাওবাদীদের মনোবল এতটাই তুঙ্গে যে, গত ১২ মার্চ হেলিকপ্টারে করে দুজন আহত বি এস এফ জওয়ানকে লাতেহার থেকে রাঁচীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল— তার উপরেও মাওবাদীরা গুলি চালায়। একজন জওয়ান মারা যায়। গত মাসে ওড়িশায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে মাওবাদীরা ৮টি জেলার ৩০টির বেশি ব্লক এরিয়া বিনাবাধায় কব্জা করে, ভয় দেখিয়ে ধমক দিয়ে কাউকেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেয়নি। প্রশাসন এতটাই দুর্বল যে, প্রার্থীদেরকে নিরাপত্তাই দিতে পারেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মতে এসময়ে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হলো ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং বিহারের। এরপর আংশিকভাবে মাও প্রভাবিত রাজ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্র। অল্প-স্বল্প প্রভাবিত রাজ্যের তালিকায় রয়েছে— উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ। মাওবাদী গেরিলাদের কিছু বাহিনী কর্ণাটকেও আছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর ওখানকার সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে মাওবাদীরা সংগঠনের বিস্তার করছে।

বিগত তিন বছরে মাওবাদীরা ১৮২৯ জন নাগরিক এবং ৭৭৫ জন নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যকে হত্যা করেছে। ওড়িশার তিরিশটি জেলার মধ্যে কুড়িটাই মাওবাদী প্রভাবিত, ঝাড়খণ্ডে ২৪টির মধ্যে ১০টি, ছত্তিশগড়ে ২৭টির মধ্যে ১৫টি এবং বিহারে ৩৮টি জেলার মধ্যে ৩০টাই মাওবাদী-নকশাল প্রভাবিত।

ওড়িশাতে মাওবাদীদের বাড়বাড়ন্ত এতটাই যে তারা গত ১৪ মার্চ কন্ধমাল জেলা থেকে দুজন ইতালিয়ান নাগরিককে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ২৫ মার্চ একজনকে ছেড়ে দেয় আর রাজ্য সরকার মাওবাদীদের দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ করে ২৭ জন মাওবাদী কয়েদীকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিলে দ্বিতীয় জনকে ১২ এপ্রিল ছেড়ে দেয়। এইসব চলার মাঝেই ২৪ মার্চ মাওবাদীদের অন্য এক গোষ্ঠী কোরাপুট থেকে ক্ষমতাসীন বিজেপি দলের বিধায়ক ঝিনা হিকাকাকে তুলে নিয়ে যায়। রাজ্য সরকার এবার হাঁটুমুড়ে আত্মসমর্পণ করে মাওবাদীদের কাছে। মাওবাদী বিরোধী অভিযান বন্ধ, ১৩ জন মাওবাদী বন্দীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার এবং অন্য সাতজনকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সম্প্রতি মাওবাদীরা ঝিনা হিকাকাকে মুক্তি দিয়েছে।

মাওবাদীরা বেশ কয়েক বছর যাবৎ গ্রামীণ ভারতের কুড়িটি রাজ্যের ২৩৩টি জেলাকে নিজেদের প্রভাবাধীন আনার পর এবার শহর এলাকায় সংগঠনের প্রসার ঘটাতে সক্রিয়। ওরা বিভিন্ন নামে প্রায় কুড়িটি সংস্থা চালাচ্ছে। সেগুলো প্রধানত মহিলা, ছাত্র, যুবক এবং শ্রমিকদের সংগঠন— শুধুমাত্র ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। ওরা চাঁদা তোলে এবং মাওবাদীদের আশ্রয় দেয়। বর্তমানে ওই সকল ছদ্ম-সংস্থাগুলো দিল্লী, কলকাতা, মুম্বাই, নাগপুর এবং গুরগাঁও প্রভৃতি স্থানে সক্রিয়। এছাড়াও গুজরাটের শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র বলে কথিত আমেদাবাদ, সুরাট, ভদোদরা এবং মহারাষ্ট্রের নাসিক, নাগপুর, ওয়ার্ধা প্রভৃতি স্থানে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে কাজ-কারবার চালাচ্ছে।

রাজ্যের গরীব মানুষদের মাওবাদীদের কবল থেকে বের করে আনার জন্য প্রভাবী সেনা-অভিযান প্রয়োজন। তবে তারও আগে রাজ্যের পুলিশবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলা, সংখ্যাবৃদ্ধি করা, আবশ্যক প্রশিক্ষণ এবং সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে গোয়েন্দা বিভাগকে চনমনে ও সতত ক্রিয়াশীল করা দরকার। প্রয়োজনীয় খবর সত্বর নিঃশব্দে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা চাই। তবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো রাজনৈতিক স্তরে মাওবাদীদের সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করা। এখন মাওবাদীরা বলে বেড়াচ্ছে যে, তারাই শোষিত পীড়িত বঞ্চিতদের কণ্ঠস্বরকে বাণী ও ভাষা দিচ্ছে। তারা উন্নয়নের নামে সরকারি প্রক্রিয়ায় জনজাতিদের শোষণের বিরোধী। কেন সরকার উন্নয়নের সেই ছবি তুলে ধরতে পারছে না যেখানে সকলের অংশগ্রহণ এবং সর্বসমাবেশক স্বরূপ দেখা যায়? গরীব মানুষ উন্নয়নের বিরোধী নয়। তবে সরকারকেও তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। উন্নয়নের সুফল সর্বত্র পৌঁছানো এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছানো জরুরী। কেবলমাত্র ঠিকাদার, রাজনৈতিক নেতা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসাররা উন্নয়নের সুফলের উপর তাদের একচেটিয়া অধিকার আনতে না পারে। প্রাকৃতিক সম্পদ যেন কেউ লুঠ করতে না পারে। এলাকার মানুষই প্রকৃতপক্ষে ওই প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃত অধিকারী।

(লেখক পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রাক্তন মহানির্দেশক। সৌজন্যে : সন্মার্গ)

দিল্লী দখল করাই মাওবাদীদের লক্ষ্য

মনমোহন শর্মা

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সম্প্রতি কেন্দ্রের গোয়েন্দা বিভাগকে দিল্লী এবং লাগোয়া রাজ্যগুলিতে মাওবাদীদের বেড়ে চলা গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। গোয়েন্দা সূত্র থেকে এই বিষয়ে গভীর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা হয়েছে। উপরোক্ত এলাকা থেকে গত বছরই দু'ডজন মাওবাদী নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিল।

রাজধানীতে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য মাওবাদীরা বিভিন্ন ভুয়ো সাংস্কৃতিক, জনজাতি এবং মানবাধিকার রক্ষাকারী সংস্থার নামের আড়ালে সক্রিয়। এটাকেই তাদের গৃহীত কার্যকর রণনীতি বলে অভিহিত করা যায়। শোনা যায় এই সময়ে মাওবাদীরা ওই এলাকায় কোনওরকম হাঙ্গামা বা উৎপাত করতে চায় না। কেননা, তা হলে তারা পুলিশ বা গোয়েন্দাবিভাগের নজরে পড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তাদের সাংগঠনিক বিস্তারের কাজটা ধাক্কা খাবে। সংবাদে প্রকাশ ১৫টি বিভিন্ন সংগঠনের নামে মাওবাদী ক্যাডাররা তাদের বিস্তারের কাজ দিল্লী, গাজিয়াবাদ, ফরিদাবাদ এবং সোনিপতের বিভিন্ন এলাকায় করে চলেছে। ভালোমতো আড্ডা জমিয়েছে। তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তার এখনই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে গত দু'বছর যাবৎ গোপনে তারা তাদের ভিত মজবুত করছে। ক্যাডারদের মধ্যে 'রণনীতিকার' ছাড়াও বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, লেখক, কলাকুশলী, আদিবাসী ও মানবাধিকার রক্ষাকারী ব্যক্তি, শ্রমিক, ছাত্র প্রভৃতিরা রয়েছে। ওই সকল সংগঠনের পক্ষ থেকে কমপক্ষে বারোটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে। তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকা গোপনে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

গোয়েন্দারা সম্প্রতি প্রমুখ নীতি নির্ধারক মাও নেতা গণপতির এক গোপন নির্দেশ হস্তগত করতে পেরেছে। ওই নির্দেশে সশস্ত্র ক্যাডারদের শহর এলাকায় ভিত মজবুত করার কথা বলা হয়েছে। ভারতের মতো দেশে কার্যকর বিপ্লবের জন্য শহর এলাকার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বলা হয়েছে স্বপক্ষে অনুকূল পরিবেশ নির্মাণের জন্য মিডিয়ার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে— মাওবাদী-নকশালীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রতিনিয়িত বেড়ে চলেছে। দেশের ১৫টি রাজ্যের ৭৫টির বেশি জেলা মাওবাদীদের কবলে। গত দশবছরে মাওবাদীরা ২৫,০০০ নির্দোষ লোককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এদের মধ্যে ৭,৫০০ জন পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা-বাহিনীর জওয়ান। স্বরাষ্ট্রদপ্তরের সূত্রমতে নকশালরা বর্তমানে হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে তাদের আড্ডা গড়ে তুলছে।

মাওবাদীদের কাছে বিদেশ থেকে অর্থ ও অস্ত্রের যোগান অনবরত ব্যাপকহারে আসছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী— মাওবাদীরা প্রতিবৎসর স্থানীয় ঠিকেদারদের কাছ থেকে তোলা এবং মুক্তিপণ বাবদ চৌদ্দশ কোটি টাকা জোরজবরদস্তি আদায় করে থাকে। এই বিশাল অর্থ নতুন ক্যাডার ভর্তি করা এবং তাদেরকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত করতে খরচ করা হচ্ছে। আবার ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিংহের মতে ওই তোলাবাজির পরিমাণ দু'হাজার কোটি টাকার মতো।

নকশালবাদ-মাওবাদ সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সাম্যবাদী চিন্তাধারার অপর নাম মাত্র। ভারতে এর আরম্ভ হয়েছিল ১৯৪৮ সালে তেলেঙ্গানা সঙ্ঘর্ষের নামে। ভারতবর্ষের উপর চীনা আক্রমণের পর ১৯৬৪ সালে সি পি আই বা ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়। চীনের সমর্থকরা মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি (সি পি আই (এম)) গঠন করে ভারতের রাজনীতিতে যোগ দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯৬৭ সালে একটি গোষ্ঠী চারু মজুমদার ও কানু সান্যালের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এক নতুন সশস্ত্র সংগঠন তৈরি করে। এই গোষ্ঠী চীনের প্রধান মাও সে তুং-কে তাদেরও সভাপতি ঘোষণা করে ('চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান')। গণতন্ত্রকে ভণ্ডামি বলে ঘোষণা করে। এই উগ্রপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের এক ছোট্ট গ্রাম নকশালবাড়ি থেকে তাদের সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু করেছিল। তখন থেকে তাদেরকে 'নকশালবাদী' নামে অভিহিত করা হতে থাকে। এদের আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্মমভাবে দমন করলেও তাদের সশস্ত্র আন্দোলন দ্রুত দেশের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে যায়। নকশালবাদের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত আদর্শ এবং রণনীতি নিয়ে মতবিরোধের ফলে নকশালরা দু'ডজন ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়। ওরা সবার আগে নিজেদের মধ্যে পরস্পর লড়াই করে রক্তপাত শুরু করে। ২০০৪ সালে পীপলস্ ওয়ার গ্রুপ (পি ডব্লিউ জি) এবং মাওয়িস্ট কমিউনিস্ট সেন্টার (এম সি সি) একত্রিত হয়ে সি পি আই (মাওবাদী) নামে এক নতুন দল গঠন করে।

কিন্তু কানুবাবুর সি পি আই (মাওয়িস্ট লেনিনিস্ট) লিবারেশন গোষ্ঠী এদের থেকে কেটে পড়ে। শোনা যায়, ওদের সঙ্গে নতুন মাওবাদীদের নীতিগতভাবে ব্যাপক মতপার্থক্য হয়। কিছু গোষ্ঠী সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে। এরা জনমোর্চা গঠন করে বিহার থেকে সংসদীয় নির্বাচনে লড়ে দুটি আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু বেশির ভাগ নকশালপন্থীদের নির্বাচনে কোনওরকম বিশ্বাসই নেই। এরা প্রথমে চীনকে আদর্শ মনে করে কৃষকদের সংগঠিত করে সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন দেখত। কিন্তু এখন ওরা বিশ্বাস করে শহর থেকে সমর্থন না পেলে সশস্ত্র বিপ্লব এবং ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্ভব নয়। নেপালে মাওবাদীরা ক্ষমতায় আসাতে এদেশের মাওবাদীরা দারুণ উৎসাহিত হয়। আন্দোলনে নবজীবন সঞ্চারিত হয়।

কেন্দ্র সরকার ২০১০ সালে দেশের মাওবাদী প্রভাবিত এলাকার ৭৮টি জেলাতে সার্বিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জেলাগুলোর মধ্যে— অন্ধ্রপ্রদেশের আটটি, বিহারের নয়টি, ছত্তিশগড়ের দশটি, ঝাড়খণ্ডের সতেরোটি, মধ্যপ্রদেশের আটটি, মহারাষ্ট্রের দুটি, ওড়িশার ১৮টি, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের তিনটি করে জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত বছরের বাজেটে প্রত্যেক জেলার জন্যে ২৫ কোটি টাকা (অফেরতযোগ্য) হিসাবে অনুমোদন করা হয়েছে। সরকারের হাতে গরীব জনজাতিদের উন্নয়ন এখন মাওবাদী কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার এক কার্যকর পন্থা। তবে উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছানো এবং যে কেউ যাতে তা অনুভব করতে পারে সেটাও দেখা জরুরী। *(সৌজন্যে : সন্মার্গ)*

চিঠিপত্র

ভারত ও হিন্দুত্ব

আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষকে সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সকল ভারতবাসীর মধ্যেই কমবেশী বিরাজমান। অর্থাৎ ভারতের জাতীয়তাবাদই হলো সাংস্কৃতিক। আর ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলো সনাতন হিন্দুধর্ম। মানবতা, উদারতা, শুচিতা, শান্তি, সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতার সংমিশ্রণে যে ধর্মের মাহাত্ম্য সুদূর প্রসারিত। তবুও এই পবিত্র ধর্মের অবমাননা বারংবার ঘটে থাকে। বস্তুত এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ তথা বুদ্ধিজীবী 'হিন্দু' শব্দটিকে বর্জনীয় ও সেকুলার ধর্ম বলে সমাজে পরিকল্পিতভাবে ধারণা তৈরি করাতে সর্বদাই সচেষ্ট। ধর্ম ছাড়া মানব জীবন সার্থক হয় না। সনাতন হিন্দুধর্মের বিধানের প্রতিধ্বনি হলো হিন্দুত্ব। হিন্দুত্বের বিশেষত্বই হলো একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তা। হিন্দুত্বই হলো ভারতীয়ত্ব। হিন্দুত্ব সর্বদা সত্যানুসন্ধানের প্রেরণা জোগায়। হিন্দুত্বের অর্থ একগুচ্ছ মূল্যবোধ। অর্থাৎ বহুত্ববাদকে স্বীকৃতি দেওয়া, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জীবনকে সঠিকপথে পরিচালিত করা। অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য। জীবন পথের পাথেয় হলো হিন্দুত্ব। এই শব্দটি কখনও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার হতে পারে না। ভারতীয় জাতির সামগ্রিক অস্মিতা সম্মান ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে হিন্দুত্বের তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। একথাও অনস্বীকার্য যে জাতীয় একতার জন্য প্রধান দায়িত্ব হিন্দুত্বের উপরেই বর্তায়। হিন্দুত্বই হলো জাতীয়ত্ব। দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেশাত্মবোধ সর্বোপরি দেশের কল্যাণে যার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশ এক, এক রাষ্ট্র ও এক জাতি। আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ মাতৃভূমির সমতুল্য। আর আমাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো উন্নত সংস্কৃতি। বিশ্বে এরকম ঐতিহ্যশালী দেশ আর নেই। এই দেশ তথা রাষ্ট্রকে বিশ্বের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রয়োজন সমগ্র জাতিকে দেশপ্রেম ও স্বাভিমানবোধে উদ্বুদ্ধ করা ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলো সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই কাজ করে চলেছে। ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে জাতীয়ভাব জাগ্রত হলে তবেই অশুভশক্তির বিনাশ সম্ভব।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

কলকাতার লজ্জা

মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে উপর্যুপরি তিনটি নারী ধর্ষণের ন্যক্কারজনক ঘটনা কলকাতা ও তাহার সন্নিহিত এলাকায় সংঘটিত হইল। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর কত কালিমা লেপন করিল তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। যে ভারত অতীতে নারী মর্যাদার পীঠস্থান রূপে এতদিন বিশ্বের সকল দেশের কাছে আদর্শ স্থান হিসেবে গণ্য হইত। আজ তাহার সেই সম্মান ভূলুণ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। এটা যে বিশ্বের যে কোনও সভ্য দেশের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির কত বড় লজ্জা তাহা বলে বুঝানো যায় না। এমনকি বিদেশিনী পর্যটকেরাও যে ইহার হাত হইতে রেহাই পান না তাহা বারবার প্রমাণিত হইয়াছে। একথাটা আমাদের দেশের সুধীবৃন্দের কাছে মোটেই অজ্ঞাত নহে। কিন্তু শুধুমাত্র লাল ফিতার বাঁধনের ফলে তারাও আজ সকলে নির্বাক।

দীর্ঘ ৩৫ বৎসর অপশাসনের ফলে এই রাজ্য সকল দিক দিয়ে অন্য রাজ্যের তুলনায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, খুন, যখম, রাহাজানি, নারী ধর্ষণ প্রকাশ্য দিবালোকে যখন তখন খুনোখুনি ও ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাহীনতার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

—পাঁচুগোপাল ঘোষ, নরেন্দ্রপুর, হাওড়া।

বিজেপি'র অবস্থা

৬ এপ্রিল বিজেপি'র ৩৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দল পালন করেছে। প্রতিষ্ঠার ৩৩ বৎসর পরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই দল এই রাজ্যে প্রায় অস্তিত্ববিহীন। দলের ভোট চার থেকে বার শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করে। বিধানসভায় দলের কোনও বিধায়ক নেই। নব্বই-এর দশকে শ্রীরামমন্দির নির্মাণ আন্দোলনের সুবাদে ভোট সর্বোচ্চ ১২ শতাংশ হয়ে যায়। উদার হিন্দু সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী জনসাধারণ এই দলের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতিতে আদবানীজীর করসেবার নেতৃত্ব বাবরি কাঠামোর বিনাশ, তৎপরবর্তীকালে দেশব্যাপী বনধ্, হরতাল ও সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং এর কার্যকর্তাদের গ্রেপ্তার দেখে সমর্থকরা এই দল থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে। ফলস্বরূপ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় দল তৃতীয় স্থানে, এমনকী অযোধ্যা বিধানসভা ক্ষেত্রেও বিজেপি প্রার্থীর পরাজয় ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে পরিস্থিতি ভিন্ন। তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণের কারণে গত নির্বাচনে ভোটদাতারা সিপিএম এবং তৃণমূলের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। বিজেপি-র ভোট আরও কমেছে। তা সত্ত্বেও সীমান্তবর্তী লোকসভা আসনগুলিতে এই দলের ভোট ভারসাম্য রক্ষায় নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ একটি বিশেষ সমস্যা। ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে গোরুপাচার, চোরাচালান, নারীপাচার প্রভৃতি রুখতে একশ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণ বিজেপির সমর্থক হয়েছেন। দল এই সমর্থকদের সংহত করতে ব্যর্থ। কিন্তু নির্বাচিত আসনে নিরবচ্ছিন্ন সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলায় নজর না দিয়ে সমস্ত বিধানসভায় প্রার্থী দিয়ে তাদের জন্য দলীয় তহবিল খরচ করার নীট্ ফল শূন্য। অন্তত নীচের স্তরে পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় এই সম্পদ কাজে লাগালে জনভিত্তি আরও মজবুত ও প্রসারিত হতে পারত। যার ফল পরবর্তী লোকসভা ও বিধানসভায় কিছু পাওয়া যেত বলে মনে হয়। জনসাধারণও একব্যক্তি কেন্দ্রিক শাসন এবং একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বিকল্প খুঁজে পেয়ে হ্যাঁ ছাড়ার সুযোগ পেতে পারত। না হলে সত্তরের সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা দেখেও যেমন সাতাত্তরে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের জরুরি অবস্থায় মিসার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পুনরায় সিপিএম সরকার আসতে বাধ্য হয়েছিল। ঘুরে ফিরে সেই আবর্তেই কাটাতে হবে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে।

—ভোলানাথ নন্দী, মাণিকপুর, মেদিনীপুর।

বর্তমান সরকারের বর্ষপূর্তিতে কিছু কথা

কমল মুখার্জি

সংবাদপত্র বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলি বর্তমান রাজ্য সরকার সম্বন্ধে একটু গলতি বা দুর্বলতা খুঁজে পেলেই সেটা নিয়েই কয়েকদিন ব্যস্ত থাকে। কিছু কিছু নেতা তাঁদের প্রচারের জন্য সেজেগুজে কথার ফুলঝুরি ফোটায় যতদিন না আর একটা বেঁফাস কথাবার্তা বর্তমান সরকার সম্বন্ধে পাওয়া যাচ্ছে। চিন্তা করে দেখুন প্রথমে আমরি কাণ্ড, তারপর বিষমদ কাণ্ড, পার্কস্ট্রিট তথা ধর্ষণ কাণ্ড ইত্যাদি। তার আগে কলেজ নির্বাচন কাণ্ড, পরের দিকে সংবাদপত্র কাণ্ড, কার্টুন কাণ্ড। সবশেষে ইমামভাতা, সিপিএম বয়কট কাণ্ড। এখন কিন্তু বিষমদ কাণ্ড, ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে আর সমালোচনা, যুক্তি-তক্কো চলছে না। প্রশ্ন হলো— এই সরকার কি কোনও প্রকার ভাল কাজ করছে না? ফরাক্কা ব্যারেজ ভেঙ্গে জল চলে যাওয়া, তারপর কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা, জবরদস্তি করে রাস্তা অবরোধ করে বসতি বানানোর চেষ্টা প্রতিহত করা, পরিবহণ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এগুলো তো ভালো কাজের লক্ষণ। এই নিয়ে সেরকম জবরদস্ত আলোচনা বা বিতর্ক সেভাবে হচ্ছে না। অবশ্য সংবাদপত্র বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলির মালিকরা তো ব্যবসা করছে, তারা মোটেই নিরপেক্ষ নয়। জাতীয়তাবাদ, দেশের মঙ্গলের কথা তাদের অভিধানে নেই বললেই হয়, যদিও সংবাদপত্রকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়।

এইসব কথা লেখায় মনে করবেন না যে আমি একজন তৃণমূল কর্মী বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ধ সমর্থক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক মাসের কাজকর্মের মধ্যে বহু অসঙ্গতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটা স্বৈরতন্ত্রী বা একনায়কতন্ত্রেরও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পার্কস্ট্রিট কাণ্ডে সফল পুলিশ অফিসার দময়ন্তী সেনকে কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে বদলি করাটা প্রতিহিংসাপরায়ণপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মমতার এই কাজের পর পুলিশ আর নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারবে? অবশ্য পুলিশ কোনওদিনই নিরপেক্ষ ছিল না। আর বামফ্রন্টের আমলে পুলিশের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। একই কথা প্রশাসন সম্বন্ধেও বলা যায়। মমতাও দেখছি সিপিএমের পথেই হাঁটছেন।

এবার আসি সিপিএমকে বয়কটের কথা।

যা সত্যই বেমানান। মমতার জ্যোতিবাবুকে দেখতে যাওয়া, জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানো শিষ্টাচারের লক্ষণ। যদিও পার্টির অনেক সমর্থক আড়ালে এই কাজের সমালোচনা করেছিল। অবশ্য জ্যোতিবাবু বা সিপিএমের ভদ্রতা বা শিষ্টাচার বলে জিনিসটা কোনওদিনই ছিল না। তাই সিপিএম পার্টির এই ব্যাপারে সমালোচনা করার কোনও অধিকারই নেই। তৃণমূলের নেতারা মুখে যেটা বলেছেন, সিপিএমের ছোট বড় নেতারা নীরবে সেই কাজ করে গেছেন। গ্রামবাংলায় বহু জায়গায় বর্তমান কাগজ বিক্রি হোত না বা পড়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। সিপিএম বিরোধিতা করা পরিবার বা ব্যক্তিকে সামাজিক বয়কট করা হোত। এগুলি বর্তমান কাগজেই প্রকাশিত হোত। পাড়ায় পাড়ায়, পরিবারে পরিবারে, ভাইয়ে ভাইয়ে এমনকী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রাজনীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হোত। তাই বলছিলাম সিপিএমের এই ব্যাপারে সাধু সাজাটা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।

সংবাদপত্র নিয়ে মমতাজী যে কথাগুলি বলছেন সে কথা মেনে নেওয়া যায় না। হতে পারে এখন প্রচুর সংবাদপত্র। সব সংবাদপত্র রাখা খরচ সাপেক্ষ। কিন্তু পাঠাগার তো পাঠকদের জন্য। সরকারের জন্য নয়। আমাদের রাজ্যটা চীন বা কম্যুনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়া নয় যে সরকার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। পাঠকের মতামত নিয়েই সংবাদপত্র রাখা যুক্তিসঙ্গত। নির্দিষ্ট কাগজের মধ্যে পাঠকবর্গ যা চায় তা-ই রাখা উচিত।

ইমামদের ভাতা প্রসঙ্গে শুধু মমতাকে দোষ দিয়েই কী লাভ? সমস্ত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির মুসলিম তোষণ তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাপারে অলিখিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে পার্টিগুলির মধ্যে। মাঝে মাঝে চিন্তা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা কি কোনও মুসলিম রাজত্বে বাস করছে? সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন মুসলিমরা সংরক্ষণের দাবী করেছিল। তখন প্যাটেল বলেছিলেন—হ্যাঁ সংরক্ষণ অবশ্যই থাকবে—একটি ট্রেন। সেই ট্রেন পাকিস্তান যাবে। আর এখন মুসলিমরা দোষ করলে 'সাতখুন' মাফ। পার্টিগুলির মুসলিম তোষণের একটাই কারণ—মুসলিমদের সংগঠিত ভোট। আজ এইসব বিষয়গুলি নিয়ে শুধু ভাবনা-চিন্তা নয়, সোচ্চার হওয়া দরকার।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ন

মাত্র দুই মিনিটে (ীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

চৈতন্যযুগের পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

পর্ব — ৯

জাড়ার মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

ক্ষীরপাইয়ের পরে এদিকের অঞ্চলে ক্ষীরপাইয়ের হালদার দীঘির উত্তর দিকের পাকা রাস্তা বরাবর জাড়া ও পরে রামজীবনপুর (পৌরশহর)। এই সড়ক বরাবর গোঘাট, গড় মান্দারণ, কামারপুকুর চটী হয়ে আরামবাগ চলে গেছে। জাড়া ও রামজীবনপুর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত, চন্দ্রকোণা থানার অধীন।

জাড়ার সমৃদ্ধি হয়েছিল আঠার শতকের শেষ দিকে জমিদার 'রায়'-'বাবু'দের অভ্যুদয়ে। 'বাবু'দের পূর্বপুরুষ আসেন বর্ধমান-রাজপরিবারের উচ্চ পদে আসীন কর্মচারীরূপে। বর্ধমানে তেলমাড়ুই গ্রামে তাঁদের বসতি ছিল। রামগোপাল রায় বা গোপাল রায়, তৎপুত্র মদনমোহন রায় এখানে বর্ধমান রাজাদের আনুকূল্যে বহু ভূ-সম্পত্তি লাভ করেন। বিশাল সম্পন্ন জমিদাররূপে মদনমোহনের পুত্র রাজীবলোচন রায় প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। রাজীবলোচন রাজা রামমোহন রায়ের সমকালীন ও প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। উভয়েরই মৃত্যু ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে। রামমোহনের বন্ধু ছিলেন রাজীবলোচন। রামমোহন যখন ১৮৩০ খৃস্টাব্দে শেষ বিলেত যান, তখন বন্ধু রাজীবলোচনের কাছে কিছু জমি বিক্রয় কোবলা করেন। তাঁর স্বহস্ত লিখিত ১৮৩০ (১২৩৭ বঙ্গাব্দ) খৃস্টাব্দের দলিলটি এখনও কোনও স্থানে রক্ষিত আছে। 'ঘাটালের কথা' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে (২০০৭) সেটি উদ্ধৃত হয়েছে।

জাড়ার জমিদার 'রায়' বাবুদের বিশাল প্রাসাদ ও বিভিন্ন মহল দীর্ঘকাল জরাজীর্ণ ও ভগ্ন হলেও তা এই অঞ্চলের এক দর্শনীয় পুরাকীর্তি যা 'হেরিটেজ'-এর পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু 'বাবু' পরিবার সমৃদ্ধ জমিদারবংশ হলেও তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য ও দর্শনীয় মন্দির তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেননি। তাঁদের বিশাল

বাঁকা রায় ও ভুবনেশ্বরের 'আটচালা' মন্দির।

প্রাসাদের প্রবেশপথের পরে ভিতরে রামেশ্বর শিবের একটি ছোট্ট 'চাঁদনি' মন্দিরে অতি অস্পষ্ট একটি লিপি থেকে জানা যায়, উক্ত মন্দিরটি ১২০২ বঙ্গাব্দে (১৭৯৫ খৃস্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত রাজীলোচন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করে থাকবেন। লিপিটি বর্তমান লেখক কর্তৃক অতিকষ্টে উদ্ধার করা হয়েছিল। পোড়ামাটির লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হলো (যথাযথ সারি ও বানান অনুসারে) :

'শ্রীশ্রীরামেশ্বর। সুভমস্ত সকাব্দা। ১৭১৭ সন ১২০২'।

প্রতিষ্ঠাতার কোনও নাম নেই। 'বাবু'দের পুরাতন ঘাটের পাশে গঙ্গাধর শিবের আটচালার লিপি থেকে জানা যায়, সেটি ১২২১ বঙ্গাব্দে (১৮১৪ খৃস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনও টেরাকোটা নেই। প্রাসাদের বাইরে কয়েকটি 'চাঁদনি' রীতির মন্দির বর্তমান, শিবের মন্দির। তার একটির প্রতিষ্ঠাকাল ১২৪৯ বঙ্গাব্দ (১৮৪২ খৃস্টাব্দ)। 'বাবু'দের ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের মাতা ১২৭৩ বঙ্গাব্দে (১৮৬৬ খৃস্টাব্দ) উমাপতি শিবের একটি 'চাঁদনি' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

জাড়ার (পাকা রাস্তার ধারে) 'চকবাজার'-এ বাঁকা রায় ও ভুবনেশ্বর শিবের দুটি 'আটচালা' রীতির মন্দির ১২৩১ বঙ্গাব্দে (১৮২৪ খৃস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়। দুটি মন্দিরই একই ভিত্তিবেদিতে অবস্থিত। কে বা কারা প্রতিষ্ঠা করেন জানা যায় না। তবে রাজীবলোচন তখন সমৃদ্ধ জমিদার ছিলেন। জাড়ার আরও কয়েকটি মন্দির বর্তমান।

জাড়ার 'বাবু'দের শীতলা পূজা ও সেই উপলক্ষে 'কবিগান' আজও কিংবদন্তীতে পরিণত। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে (১৮৬৯ খৃস্টাব্দ) বাবুদের যে শীতলাপূজা উপলক্ষে 'কবিগান' হয়, তার কয়েকটি পংক্তি 'কি করে বললি জগা জাড়া গোলোক বৃন্দাবন' 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' চলচ্চিত্রে কলকাতার প্রসিদ্ধ কবিয়াল ভোলা ময়রার বলে চলিত হলেও এটি আসলে ঘাটালের প্রসিদ্ধ কবিয়াল হরিবোল দাসের ছিল। তিনি চন্দ্রকোণার আর এক কবিয়াল জগা ধোপাকে (জগন্নাথ) যে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, এটি তাঁরই মুখে মুখে রচিত হয়। গানটির ইংরাজি অনুবাদও হয়। 'How do you call Jaga Jarah Heven's compound ?' জাড়ার ইতিহাস সেকারণে আকর্ষণীয়। গ্রামে মন্দির ছাড়া কয়েকটি বিশালাকার পুষ্করিণী ও দীঘি আছে। তার মধ্যে গ্রামের বাইরে 'ছোট গিন্নির' নামে পুকুরটি সুপরিচিত। এর স্বচ্ছ জল পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হোত। এখন সেটি মজে এসেছে। জাড়ার 'বাবু'দের দুর্গোৎসব এক সময় খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। পুজোর কয়েকদিন গ্রামের সকলে নিমন্ত্রিত হয়ে ভুরিভোজে আপ্যায়িত হতেন। এখন সেই দুর্গাপুজো কোনও রকমে সম্পন্ন হয়। এক সময় সমৃদ্ধ জনপদ জাড়ার ইতিহাস খুবই গৌরবময় ছিল।

পরম্পরা

জীবন চর্যায় ধ্যান

নবকুমার ভট্টাচার্য

ধ্যান নিয়ে প্রথম লিপিবদ্ধ আলোচনা করেন মহর্ষি পতঞ্জলি। তাঁর ‘যোগসূত্র’ বইটির মধ্যে রয়েছে ধ্যানের বিস্তৃত আলোচনা। যোগ শব্দের অর্থ উত্তীর্ণ হবার উপায়। যোগ-বিশারদেরা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ঐক্যকে যোগ বলেছেন। যোগ অভ্যাসের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়। অন্তরে শুদ্ধ ভাবের সঞ্চার হয় এবং সেই ভাব ক্রমে মহাভাবে পরিণত হয়। যোগের ৮টি স্তর। তার প্রথম চারটি হলো যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম। এগুলো হঠ্‌যোগের মধ্যে পড়ে। হঠ্‌যোগে দৈহিক ব্যাপারটাই প্রধান। শেষের ৪টি হলো প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এগুলো রাজযোগের মধ্যে পড়ে। রাজযোগ মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারটাই মুখ্য।

ধ্যান কি? তা জানতে হলে প্রত্যাহার স্তর থেকে জানা উচিত। প্রথমে জানতে হবে কি প্রত্যাহার করব? কাকে প্রত্যাহার করব? উত্তর— ইন্দ্রিয় যেসব বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তা থেকে মনকে গুটিয়ে নেওয়া। প্রত্যাহারের পরবর্তী স্তর হলো ধারণা। ধারণা হচ্ছে কোনও বিশেষ বিষয়ে মনটাকে আকৃষ্ট করা। বিশেষ বিষয়টি ‘ওঁ’ হতে পারে কিংবা জ্বলন্ত মোমবাতি হতে পারে। ইংরেজিতে তাকে বলে কনসেনট্রেশন। কনসেনট্রেশন বা ধারণার পরিণত রূপ হলো ধ্যান। সমস্ত চিন্তা থেকে মনকে নিবৃত্ত করা হলো ধ্যান। প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা যে ধ্যান করতেন আজকের মেডিটেশন তার সরল সংস্করণ বলা যেতে পারে। তবে ধ্যান করতে গেলে কতকগুলি প্রথার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ধ্যানের নানা রকমফের রয়েছে। যেমন চোখ খুলে এক ধরনের ধ্যান রয়েছে যা বাহ্যিক ধ্যান। চোখ বন্ধ করে যে ধ্যান তা অন্তর্মুখী ধ্যান। মন্ত্র উচ্চারণ বা জপ করে করা হয় শব্দব্রহ্ম ধ্যান। জ্বলন্ত মোমবাতি বা প্রদীপ বা ওঁ-এর দিকে তাকিয়ে এক প্রকার ধ্যান করা যায় যা বহির্মুখী ধ্যান। আবার চোখ বন্ধ করে নিজের জ্যোতি দর্শন করার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে এক ধরনের ধ্যান হয় যা অন্তর্মুখী জ্যোতি ধ্যান। ধ্যান করার সব থেকে ভালো সময় হলো ভোরবেলা কারণ এই সময়ে পরিবেশে এক ধরনের প্রশান্তি বিরাজ করে। গোপীনাথ কবিরাজ অবশ্য বলেছেন মুক্ত মন হলো ধ্যানের ভালো সময়। পদ্মাসন, অর্ধ পদ্মাসন, বজ্রাসন, শবাসন প্রভৃতি ভঙ্গিতে ধ্যান করা যেতে পারে। ধ্যান করলে মানসিক, স্নায়বিক ও শারীরিক প্রভূত উন্নতি হয়। ধ্যান মানুষের ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি কতটা বাড়াতে

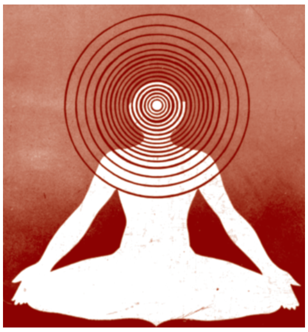

পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজি লিখেছেন— ‘প্রথম কোনও একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। এক সময় আমি একটা কালো বিন্দুতে মনঃসংযম করতাম। ঐ সময়ে শেষে আর বিন্দুটাকে দেখতে পেতুম না বা সামনে যে রয়েছে তা বুঝতে পারতুম না। মন নিরোধ হয়ে যেত, কোনও বৃত্তির তরঙ্গ উঠত না।’ ধ্যানের মূল লক্ষ্য হলো আত্মদর্শন। আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের পথ হচ্ছে ধ্যান। স্বামীজী বলেছেন, ‘প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে দেবত্ব। সেই অন্তর্নিহিত দেবত্ব শক্তিকে জাগাতে পারে একমাত্র ধ্যান। ধ্যানের গভীরে যখন আমরা দেহ মন ইন্দ্রিয়ের অতীত অবস্থায় পৌঁছে যাই তখনই আমরা আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করি।’

কারও সঙ্গে কোনও কথাবার্তায় না গিয়ে একটু নিজের মতো থাকা অথবা অন্ধকার ঘরে চুপ করে চোখ বন্ধ করে একটু শুয়ে থাকা— অদ্ভুত এক প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ে মনে। এটাই ধ্যানের প্রথম সূচনা। শাস্ত্র বলছে, যোগসাধনায় মিতাহার অত্যাবশ্যক। ধ্যানের পূর্বাবস্থা যে প্রত্যাহার সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে, প্রত্যাহার শব্দের সহজ অর্থ ফিরিয়ে আনা। চঞ্চল অস্থির মন যেখানে সেখানে ছুটে যায় সেই সেই স্থান থেকে তাকে ফিরিয়ে এনে আত্মবশে রাখতে হয়— এরই নাম প্রত্যাহার। বেদান্তসার গ্রন্থে বলা হয়েছে— ইন্দ্রিয় সমূহের স্ব স্ব বিষয় থেকে প্রত্যাহরণ প্রত্যাহার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে মনকে প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া হিসেবে ধ্যানের প্রাথমিক কিছু উপদেশ দেওয়া হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘রাজযোগ মেডিটেশন’-এর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে একটি সাতদিনের বেসিক কোর্স (০৩৩-২৫৭৪-৭৮৬৩) করানো হয়। ইসকনের বিভিন্ন সেন্টারে প্রত্যহ ধ্যানের ক্লাস হয়। শ্রীঅরবিন্দ ভবনেও (০৩৩-২২৮২-৩০৫৭) নিয়মিত ধ্যানের চর্চা হয়। স্বামী রামদেব বলেছেন--- ধ্যানের নিয়মিত অভ্যাসের ফলে দেহে একধরনের বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হওয়ায় আমাদের কর্মদক্ষতা বাড়ে। মন একাত্ম হওয়ার কারণে এক অদ্ভুত শান্তি ও আনন্দ আমাদের মনে বিরাজ করে এবং সেই শান্তির ফলে রাগ, দ্বেষ, হিংসা দূর হয়। কিভাবে ধ্যান করবেন? হঠ্‌যোগ প্রদীপিকায় বলা হয়েছে প্রত্যহ দু’বার সকাল এবং সন্ধ্যায় যোগাভ্যাস করতে হয়। কঠোপনিষদে রয়েছে— যখন মনের সঙ্গে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপার শূন্য হয়ে অবস্থান করে এবং বুদ্ধিও চেষ্টা করে না অর্থাৎ নিজ কাজ করে না তখন সেই অবস্থাকে পরমগতি বলা হয়। ইন্দ্রিয়পরায়ণারূপ এই স্থির অবস্থাই হলো ধ্যান। এখন কীভাবে ধ্যান অভ্যাস করবেন— শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে সাধক মাথা ঘাড় এবং বুক উঁচু করে শরীরকে সোজা রেখে শান্তভাবে স্থির হয়ে বসে থাকবেন। মন স্থিরতা ধ্যানের প্রথম লক্ষণ। প্রথম প্রথম মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন আসবে, নানা ছবি আসবে, তারপর সব স্থির হয়ে যাবে। এইভাবে নিয়মিত অভ্যাস করতে করতে ধ্যানে প্রবেশ করা যাবে। ধ্যানের মহিমাদ্বারা দীপ্যমান হয়ে দেবতা স্বরূপে প্রবেশ করেন এবং বাতাসের গতি প্রাপ্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ফলহারিণী কালীপুজো

অর্ণব নাগ

ফলহারিণী কালীপুজোর দিনে মা সারদামণিকে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বয়ং জগদম্বারূপে পুজো করার তাৎপর্য বলে বোঝাবার বিষয় নয়, উপলব্ধির বিষয়। প্রথমত, সংসার আশ্রমে সন্ন্যাসব্রতের সর্বকালের যে সর্বোত্তম পরাকাষ্ঠা শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরবর্তী সময়ে জগৎবাসীকে উপহার দিয়েছেন তার আনুষ্ঠানিক সূচনালগ্ন হিসেবে ওই ফলহারিণী কালীপুজোর দিনটি চিহ্নিত হয়ে থাকবে। দ্বিতীয়ত, সেই সময় সমাজ ও পরিবারে নারী যখন অবহেলার পাত্রী তখন তাঁকে দেবীজ্ঞানে পুজো এবং আপন ভার্যাকে মাতৃজ্ঞানে পুজো যে এর আগে কখনও জগৎবাসী দেখেননি সেকথা হলফ করেই বলা চলে। তৃতীয়ত, ইতিপূর্বে আপন স্বামী সম্বন্ধে 'পাগল' ইত্যাদি অনেক কথাই মা সারদামণি শুনেছিলেন। কিন্তু পতিদেবতাকে সামনে দেখে সত্যিকারের দেবদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এতকালের শোনা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে কটূকথাগুলিকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি তিনি। চতুর্থত, কাম-কাঞ্চনত্যাগী ভবিষ্যত সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সঙ্ঘজননী হিসেবে শ্রীশ্রী মা-কে ওইদিনই স্বহস্তে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' (সাধকভাবে), উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রী মায়ের কথা' (অখণ্ড সংস্করণ, পৃঃ ২২৭), স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত 'শ্রীমা সারদা দেবী' (দেবীর বোধন) ইত্যাদি আকরগ্রন্থে এই পুজোর সবিস্তার বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। অমাবস্যা তিথিতে ফলহারিণী কালীপুজোর দিনে শ্রীশ্রী জগদম্বাকে তাঁর ষোড়শী (শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরী) মূর্তিতে পুজো করার মনোবাসনা হয়েছিল ঠাকুরের। এই পুজোর আয়োজন কিন্তু মন্দিরে হয়নি, হয়েছিল ঠাকুরের কক্ষে, সমস্ত দরজা বন্ধ করে, নিভৃতে গুপ্তভাবে। পুজোর আয়োজনে প্রথমে ঠাকুরের সহযোগী ছিলেন তাঁর ভাগ্নে হৃদয়। কিন্তু সেদিন কালীমন্দিরে তিনি বিশেষ পুজোয় ব্রতী থাকায় যথাসম্ভব সাহায্য করে মন্দিরে চলে গিয়েছিলেন। পরে রাধাগোবিন্দের রাত্রিকালীন সেবা পুজো সমাপ্ত করে মুকুন্দপুরনিবাসী শ্রীমায়ের ভাসুরপুত্র দীনু পূজারী ঠাকুরের ঘরে এসে অবশিষ্ট আয়োজনে হাত লাগালেন। পূজাদ্রব্য সমস্ত যথাস্থানে সজ্জিত হলো। আরাধ্যাদেবীর কোনও প্রতিমা না থাকলেও তাঁর জন্য আলপনা আঁকা পিঁড়ে ঠাকুরের চৌকির উত্তরে পূজকের সামনে স্থাপিত হলো। এভাবে ষোড়শী বা ত্রিপুরসুন্দরীর পুজোর আয়োজন শেষ করতে রাত ন'টা বেজে গেল। দীনু পূজারী আয়োজন শেষে চলে গেলেন।

শ্রীশ্রীমা-কে পুজোর সময় উপস্থিত থাকবার

জন্য ঠাকুর পূর্বেই বলে পাঠিয়েছিলেন। সেইমতো শ্রীমা ঘরে এসে নিবিষ্টচিত্তে ঠাকুরের পুজো দেখতে লাগলেন। ঠাকুর পূর্বমুখী হয়ে পশ্চিমদিকের দরজার কাছে বসেছিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে পুজোর দ্রব্যাদি শোধনের পর তিনি যথাবিধি পূর্বকৃত্য শেষ করলেন এবং মা সারদামণিকে নির্দিষ্ট পিঁড়িতে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। পুজো দেখতে দেখতে শ্রীশ্রীমায়ের অর্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হয়েছিল। সুতরাং কেন করছেন, কি করছেন না ভেবে তিনি মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় পশ্চিমাস্য হয়ে ঠাকুরের সামনের পিঁড়িতে বসলেন ('লীলা প্রসঙ্গ-এ' পূর্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণভাগে উত্তরাস্য হয়ে বসার উল্লেখ আছে। তবে এখানে শ্রীশ্রীমায়ের স্বমুখের কথাই অনুসৃত হলো)।

মন্ত্রপূত কলসের জল নিয়ে ঠাকুর বারংবার শ্রীমায়ের অভিষেক করলেন। তারপর তাঁকে মন্ত্র শুনিয়ে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করলেন, ''হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার (শ্রীমায়ের) শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।'' পরে ঠাকুর মায়ের দু'পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুর, অঙ্গে নতুন বস্ত্র পরিয়ে দিলেন, মুখে পান মিষ্টি দিয়ে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁকে ষোড়শোপাচারে পুজো করলেন। শ্রীমা তখন সবেমাত্র উনিশ বছরে পদার্পণ করেছেন। যদিও তিনি প্রায়ই এ প্রসঙ্গে বলতেন, 'আমি তখন ষোল বছরে পড়েছি।' ১২৮০ সালের ১৩ জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮৭৩-এর ২৫ মে) না কি ১২৭৯ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ (ইং ৫ জুন, ১৮৭২)— ঠিক কোন বছরের ফলহারিণী কালীপুজোয় ঠাকুর শ্রীশ্রীমা-কে সাক্ষাৎ জগদম্বারূপে পুজো করেছিলেন তা নিয়ে সংশয় থাকলেও, সাবধানে সবদিক বিচার করে ১২৭৯-র ২৪ জ্যৈষ্ঠ-ই যে এই পুজো হয়েছিল, স্বামী গম্ভীরানন্দের মতো গবেষকরা তা মেনে নিয়েছেন।

এই হিসেব মতো ঠাকুরের বয়স তখন ৩৬, শ্রীশ্রী মায়ের ১৯। অর্থাৎ সেই পুজোর সময় ঠাকুর পূর্ণ যৌবন সম্পন্ন, মা নবযৌবনাগতা। যাই হোক পূজান্তে ভোগ নিবেদিত হলো। অবশেষে পূজক নিবেদিত মিষ্টান্নাদির কিয়দংশ ঠাকুর স্বহস্তে তুলে নিয়ে আরাধ্য দেবীর শ্রীমুখে প্রদান করলেন। দেখতে দেখতে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা মাতাঠাকুরাণী সমাধিস্থ হলেন। ঠাকুরও অর্ধবাহ্য দশায় মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে সমাধিরাজ্যে চলে গেলেন। সেই ভূমিতে আত্মসংস্থা পূজারী ও পূজিতা আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে একীভূত হলেন। এইভাবে সুদীর্ঘকাল কেটে গিয়ে যখন মধ্যরাতও ফুরিয়ে এসেছে তখন আত্মারাম ঠাকুরের ব্যুত্থানের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিল। অর্ধবাহ্যদশায় উপনীত হয়ে তিনি দেবীরূপী সারদাকে আত্মনিবেদন করলেন। তারপর নিজ সাধনার ফল ও জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব দেবীর শ্রীচরণে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে তাঁকে প্রণাম করলেন— ''হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে। হে সর্বকর্ম নিষ্পন্নকারিণী, হে শরণদায়িনী, ত্রিনয়নী, শিবগেহিনি গৌরী, হে নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম করি।'' পুজো শেষ হলো---''মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীয় উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল।'' পুজোর শেষে বাহ্যভূমিতে ফিরে নহবতে যাবার সময় শ্রীশ্রীমায়ের মনে পড়লো, পুজোর সময় ঠাকুরের প্রণাম ফিরিয়ে দেননি, তাই ঠাকুরকে মনে মনে প্রণাম করে তিনি নহবতে ফিরেছিলেন। ঠাকুরের পরামর্শ অনুযায়ী গুরুমা না থাকার জন্য পুজোয় প্রাপ্ত শাঁখা, শাড়ী ইত্যাদি দ্রব্য নিজের গর্ভধারণী মা শ্যামাসুন্দরী-কে দিয়েছিলেন তিনি। এবং ঠাকুরেরই উপদেশমতো তা তাঁকে দিয়েছিলেন মানুষজ্ঞানে নয়, সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে। জগৎ সাক্ষী থাকল এক অপরূপ দৈবী আরাধনার।

নবাঙ্কুর

গল্প বানানোর খেলা

বাঘের গলায় ফুটে থাকা হাড় তোলা

ক্লাসে ঢুকেই মিতালিদি বললেন, 'এবার প্রত্যেক মাসের প্রথম সোমবার তোমাদের ক্লাসটা হবে গল্প বানানোর। আমি একটা গল্পের সূত্র ধরিয়ে দেবো। তারপর সাতজন গল্পটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি যার নাম বোর্ডে লিখে দেবো সে গল্প বলবে। আজকের গল্পের শুরু হবে—

'একদিন এক বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিল।' দিদিমণি বোর্ডে নাম লিখলেন চয়নিকা। সে গল্প শুরু করল।

'বাঘটার সকাল থেকে স্বস্তি নেই। একটা হরিণ পাশ দিয়ে গেলো। ধরার ইচ্ছে দূরে থাক দেখার ইচ্ছেও হলো না। হরিণটা তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে কচি পাতা খেয়ে চলে গেলো। হরিণের মা বললে, 'তুই ওদিকে গিয়েছিল কেন? বাঘটার হয় শরীর খারাপ, নয় মন খারাপ। নয়তো ওর কাছে গেলে আর রক্ষে থাকত তোর! আর ভুলেও যাসনে বাছা। এখন চল ওদিকে, নরম পাতা আর ফল আছে।'

টুং করে একটা ঘণ্টা বাজালেন মন্দিরাদি। বোর্ডে নাম অনুষ্কা। সে বলতে শুরু করল, 'বাঘদের বাড়ির কেউ ডাক্তারের খোঁজ করছিল। জঙ্গলের বাইরে হাবু ডাক্তার থাকে। খুব নামডাক তার। হাবু ডাক্তারের বাড়ি খবর পাঠানো যায় কীভাবে? একবার এক বনরক্ষীর পকেট থেকে সেলফোন পড়ে গিয়েছিল। বাঘের পিসতুতো ভাইয়ের কাছে ছিল। ফোনটা কিছুতেই চালু করা গেল না বিপদের সময়!'

ঘণ্টা বাজল। এবার বোর্ডে নাম শকুন্তলা। গল্প এগিয়ে নিয়ে গেলো সে। 'বনের মাঝখান দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যায় পাহারাদার হীরু সামন্ত। খুব সাহস তার। লাঠি চালাতে পারে খুব ভালো। অসুস্থ বাঘটার ভাইকে বাঁচিয়েছিল চোরা শিকারীদের হাত থেকে। হীরু জঙ্গলের সকলের বন্ধু। সে গাছ লাগায়। আবার বাঁশি বাজায়। মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ হীরুকে জঙ্গলে সাবধানে ঘুরতে বলে!'

আবার ঘণ্টা। বোর্ডে পরবর্তী নাম : শাশ্বতী। গল্প এগোল। 'কে যেন দূর থেকে দেখতে পেলো হীরু আসছে গান গাইতে গাইতে। হ্যাঁ, চিল প্রথম দেখতে পেয়েছিল। হাবু ডাক্তার তিনদিন ধরে জ্বরে ভুগছে। সেই খবরটা দিয়েছিল চিলই। হাবু ডাক্তার অনেক খাবার দেয়। তার বাড়িতে দলে দলে হাজির হয় কাক চিলেরা। ডাক্তারের কাজের লোক কাকচিলদের খাবার দিচ্ছে কদিন। ডাক্তার শুয়ে শুয়ে দেখে।'

ঘণ্টা বাজল। এবার বলতে শুরু করল সায়ন্তনী। 'হীরুর সামনে গিয়ে তার টুপি খুলে নিল চিল। উড়তে শুরু করল। হীরু বলল, টুপিটা ফেরত দে বাবা। মাথায় রোদ লাগবে। হীরু সাইকেল নিয়ে চলল। তার মনে হচ্ছে, চিল কোথাও নিয়ে যেতে চায়! কারও কোনও অসুবিধে বিপদ আপদ হলো নাকি? হীরু সামনে তাকিয়ে সাইকেল চালাতে লাগল।'

এবার ঘণ্টা বাজতে উঠল সৌমিলি। 'হীরু জঙ্গলের এক জায়গায় দেখল বাঘটা চুপ করে বসে আছে। চিলটা টুপিটা ফেলে দিলে সামনে। বাঘের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। হীরু সাইকেল রেখে এগিয়ে গেলো। বাঘ বলতে চাইল 'গলায় হাড় ফুটেছে।' হীরু তার সাইকেলে রাখা ব্যাগ নিয়ে এলো। বের করল সাঁড়াশি আর টর্চ। হাঁ করল বাঘ! টর্চ দিয়ে দেখতে পেলো হাড়টা। টর্চটা একটা গাছের ডালে বাঁধল। তারপর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে বের করল হাড়। সবাইকে দেখাল ছুঁচলো বড় হাড়।'

ঘণ্টা বাজল। শেষ নাম রাজশ্রী। 'বাঘের গলার হাড় বেরিয়ে গেছে। সকলেই খুশি। হীরু হোমিওপ্যাথি ওষুধ পাঁচ শিশি খাইয়ে দিয়ে বলল, 'সাবধানে থাকিস।' বাঘের বাড়ির সামনে অনেক কলাগাছ ছিল। হীরুকে এক কাঁদি কলা কেটে দিল বাঘের ভাই।'

ক্লাস শেষের ঘণ্টা বাজল। মিতালিদি বললেন, 'কেমন হলো গল্প?' সবাই বলল, 'দারুণ।'

কৌশিক গুহ

অন্য বার্তা

রাজারহাটে গাছ চেনানো

ভালোবাসা জাগানোর জন্যে গাছ-পাঠশালা

কলকাতা আর তার আশেপাশে দেখার ও বেড়াবার জায়গা কম নয়। যার যেদিকে ঝোঁক সে যাচ্ছে সেদিকে। আবার দলে দলে গিয়ে ভিড়ও করছে কোনও কোনও জায়গায়। নগর সাজানো থাকলে ঘুরে ফিরে সব জায়গাই ভালো লাগবে। সেজন্যে আগেভাগে জেনে নিতে হবে কোন জায়গাটা কেন বিখ্যাত। কি কি বৈশিষ্ট্য আছে। কি কি দেখা দরকার। নতুন নতুন অনেক বেড়াবার জায়গা তৈরি হচ্ছে। যেমন রাজারহাট নিউ টাউনে তৈরি হচ্ছে ইকো-ট্যুরিজম পার্ক। তার মানে হলো বেড়ানোর ব্যবস্থার সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে এমন ব্যবস্থা হবে যাতে কিছু শেখার সুযোগ থাকবে। আমরা গাছ দেখেছি অনেক। কিন্তু চিনতে পারিনি সব গাছ। গাছের চলতি নাম আছে। আবার রয়েছে বোটানিক্যাল নাম। গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক, সে গোলাপই। তার বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় সহজে। নারকেল গাছের বোটানিক্যাল নাম না জানলেও গাছটা চিনে নিতে পারি। কিন্তু যাঁরা বেড়াতে আসবেন তাঁদের মধ্যে অন্য দেশের লোকজন থাকতেই পারেন। বোটানিক্যাল নাম না লেখা হলে তাঁদের পক্ষে বোঝা অসুবিধে। রাজারহাটে দেখানো হবে প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেসব গাছের উল্লেখ রয়েছে সেগুলি। সব গাছ তো এদেশের নয়। ভিনদেশি গাছ এদেশের মাটিতে কখনও বড়ো হয়েছে, কখনও রাখা যায়নি। কত গাছ মনে রাখতে পেরেছি, কত গাছের নাম ভুলে গেছি। যাই হোক, সব গাছ যত্নে লাগানো হবে ইকোপার্কে। গাছগুলো ডাক দেবে সকলকে? ডাক দেবে ঠিকই কিন্তু সেই ডাক শুনতে পাবে কজন? যারা গাছ ভালোবাসে তারা এবার প্রাণভরে দেখবে নানারকম গাছ। গাছের পাশে লেখা থাকবে নাম। সেইসঙ্গে জানানো হবে, রবীন্দ্রনাথের লেখার কোথায় ওই গাছের নাম রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, আমাদের প্রকৃতি-পাঠের আরেক পর্ব শুরু হবে ওইভাবে।

—**বার্তাবহ**

সিদ্ধার্থ-স্যারের বই

সিদ্ধার্থ-স্যার স্কুলে মন দিয়ে পড়ান। ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো বুঝিয়ে দেন। কখনও রাগ করেন না। একই জিনিস কতবার বোঝাতে হয়। কাউকে বকেন না। মারা তো অনেক দূরের ব্যাপার। যেদিন ছাত্রদের পড়ানো শেষ হয়ে যায় গল্প বলেন। গল্পের ভাঁড়ার তাঁর যেন শেষ হয় না। একেক ক্লাসে একেকরকম গল্প বলেন। সকলে তো সবরকম গল্প বুঝবে না। কোনও কোনও গল্প বারবার বলতে হয়। বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলার সময় দেখেছেন ছোটোরা চোখ বড়ো বড়ো করে শোনে। আগে বলা কোনও গল্পের বিড়াল কুকুর হয়ে গেলে ছোটোরা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে। বলে, 'সেদিন তুমি বিড়াল বলেছিলে, আজ কুকুর বললে কেন?' ওই স্কুলে মাস্টারমশাইদের 'তুমি' বলা হয়। নামের সঙ্গে 'দাদা' যোগ হয়। আর শিক্ষিকাদের নামে সঙ্গে যোগ হয় 'দিদি'। খুব ছোটোরা যেভাবে ডাকে, বড়োরাও সেভাবে সিদ্ধার্থ-স্যারকে বলে 'সিদ্ধার্থদা'।

অনেক গল্পের বই কিনে আনেন। দশটা বই একটা ক্লাসে থাকলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিরিশজন পড়তে পারে। ওইভাবে তিনি বাছাই করে ক্লাস থ্রি থেকে এইট পর্যন্ত ছটা ক্লাসের ছেলেমেয়েদের জন্যে বই এনে রেখেছেন। হেডস্যার তাঁর জন্যে একটা আলমারি দিয়েছেন। বেশি উঁচু নয়। ছটা থাক। একেক থাকে একেক ক্লাসের জন্যে বই। ছটা খাতা আছে। তাতে ছেলেমেয়েদের নাম লেখা। কে কোন বই নিচ্ছে, কবে ফেরত দিলো সেটা লেখা থাকে। তিনি আর একটা জিনিস দেন প্রত্যেককে। একটা কার্ড। পড়া বইটা কেমন লাগল তা জানাতে হয়। সিদ্ধার্থ-স্যার সেসব যত্নে রাখেন। প্রতিমাসে নিজের মাইনের টাকা থেকে দুশো টাকার বই কেনেন ছেলেমেয়েদের জন্যে। প্রত্যেকের নাম মনে রাখেন। কে কেমন বই পড়তে ভালোবাসে তাও মনে থাকে। প্রাইভেট টিউশনি করেন না। তবে কয়েকটি গরীব ছেলেমেয়েকে বাড়িতে পড়ান বিনা পয়সায়। তাদের জলখাবার তৈরি করে যত্নে খাওয়ান স্যারের বউ। —**বইমিত্র**

প্রশ্নবাণ

১. 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির কাহিনীকার কে?

২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একা কোন বই সংকলন করেন।

৩. 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' কার লেখা? ওই নামে চলচ্চিত্রের পরিচালক কে ছিলেন?

৪. 'অজগর আসছে তেড়ে/আমটি আমি খাব পেড়ে'।—এই ছড়া কার লেখা?

৫. 'ঠাকুরমার ঝুলি' কার লেখা?

উত্তর ১. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ২. বঙ্গীয় শব্দকোষ। ৩. শিবরাম চক্রবর্তী। ঋত্বিক ঘটক। ৪. যোগীন্দ্রনাথ সরকার। ৫. দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার।

ছোটোদের বলছি

ছোটোরা 'স্বস্তিকা'র নবাঙ্কুরের মধ্যে হয়তো একটু মজা খুঁজে পাচ্ছো। সব ঠিকমতো সাজানো হচ্ছে কিনা এই ভাবনা থাকে। তোমরা ভুলটুল থাকলে বলবে। সেইসঙ্গে জানাবে কি কি চাও। আমাদের জায়গা কম। তার মধ্যে যেটুকু সম্ভব তা করা হচ্ছে। হ্যাঁ, তোমরা লেখা পাঠাও। সেইসঙ্গে পাঠিয়ে দাও আঁকা ছবি। নাম, স্কুলের নাম, বয়স লিখতে ভুলবে না কিন্তু।

—*সম্পাদক, স্বস্তিকা।*

উল্টো পাল্টা

পীতারুণ-স্যার অঙ্কের ক্লাসে অমিতকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার বাবার বয়স কত?'

অমিতের চটপট উত্তর, 'আমার যত বয়স।'

স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে?'

অমিত হেসে সহজভাবে বলল, 'আমি জন্মাবার পরই তো বাবা, বাবা হয়েছে।'

।। ২।।

সেদিন ক্লাসে অঙ্কের স্যার বললেন সুমহানকে, 'তোমাকে কুড়ি টাকা দেওয়া হলো। তার থেকে দশ টাকা আমাকে দিলে। কত টাকা থাকবে তোমার কাছে?'

সুমহান বলল, 'কুড়ি টাকাই থাকবে স্যার।'

শিক্ষক বললেন, 'কেন?'

ছাত্রের উত্তর, 'আপনি দশ টাকা চাইলেন। কিন্তু তার মানে এই নয় টাকাটা আপনাকে দিয়েছি।'

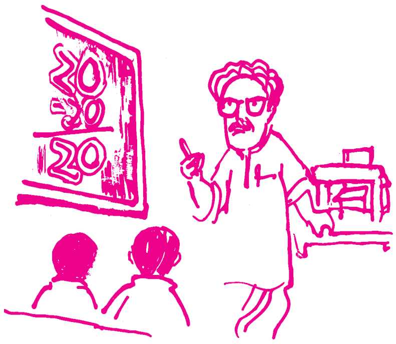

।। ৩।।

শিক্ষক বললেন : ১৮৬৩-তে কি হয়েছিল?

ছাত্র : স্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন।

শিক্ষকের প্রশ্ন : ১৮৯৩-তে কি হয়েছিল?

ছাত্র : বিবেকানন্দের তখন তিরিশ বছর বয়েস।

রামগরুড় সংকলিত

যন্ত্রণার আকারে নারী

বিদিশা ভট্টাচার্য

“সাড়ে ১০টায় মায়ের স্নেহ চুম্বন নিয়ে স্কুলে বেরোনো, ৪ : ৩০টে ছুটি! কিন্তু ৬টা বেজে গেল— মেয়ে তো ফিরল না। কোথায় গেল, কী হলো, কখন আসবে? অনেক প্রশ্নের ভিড় মনে এল। কিন্তু ফিরবে কী করে, মেয়েটি তো পণ্যের মতো বিক্রি হয়ে গেছে।”...

সে তো আর নেই সেই মায়ের ছোট্ট সোনা, সে এখন হয়ে গেছে অন্যের ভোগের পাত্রী। সে এখন ধর্ষিতা এক রমণী। খুব পরিচিত এই ঘটনা আপনার আমার সবার কাছে। যতটা সহজে কালি খরচা করে লিখলাম, ভেবে দেখুন তো ব্যাপারটা কী ততটা সহজ?

নারী’-রা আসলে কী? কেন হয় এরকম তাদের সঙ্গে? পুরাণ থেকে নারীরা অন্যের মনোরঞ্জনের রসদ ছিলেন। কিন্তু এই নারীকেই আবার প্রতিমারূপে পূজা করা হয়। দেবদেবীর সংখ্যা বিচারে নারী মূর্তির অর্থাৎ দেবীর সংখ্যা বেশি। নারীদের নিরাপত্তা কোথায়? সকাল থেকে রাত প্রত্যেকটি মুহূর্ত তারা ভয়ে তটস্থ। এই বোধহয় কিছু না হয়। ‘লজ্জা নারীর ভূষণ”— এই সম্পদটি নারীকে বাঁচিয়ে রাখে।

রাস্তায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বহুতল বাড়িতে, হাসপাতালে প্রভৃতি স্থানে নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, অন্তঃসত্ত্বা মহিলার পেটে লাথি মেরে কিছু জানোয়ার রূপী পুরুষ তাকে ব্যবহার করেছে। শিক্ষকের কাছে পড়তে গিয়ে ছাত্রীটি ধর্ষণের শিকার হয়েছে। হাসপাতালের বেডে অসুস্থ রোগীর প্রতি ডাক্তারের কু’নজর। এছাড়া ট্রেনে, বাসে, মেট্রোতে নারীরা শুধুই কু-ইঙ্গিত, কু-বাক্যের মুখোমুখি হচ্ছেন।

তাহলে স্বাধীন ভারতে, পরিবর্তনের যুগে নারীদের স্বাধীনতা কোথায়? যাদের মধ্যে নতুন প্রাণ সৃষ্টি করার শক্তি আছে, তাদেরকেই মেরে ফেলা হচ্ছে। কেন? কেন? কেন? এর জবাব কে দেবে? ‘The naked king’ কবিতার মতো কোথায় সে ছোট্ট ছেলেটি যে সেই মুখোশ ধারী সদাহাস্য মানুষগুলোর আসল চেহারাটা দেখাতে পারবে। আমরা তাকে চাই, সেই ছোট্ট শিশুর মতো সৎসাহস চাই। ইতিহাস জুড়ে বহু মহিলা, মেয়েদের দাবী নিয়ে লড়াই চলেছে। নারীরা দুর্বল, অপমান, গঞ্জনা গতর খাটিয়ে খাওয়া, জন্ম থেকে মৃত্যু একজন পুরুষের থাকা, এসব কথায় যতটা নারীকে নিয়ে বলা হয় ততটা কী বলা হয় নারীদের সাহস বীরত্বের কথা!

বোধহয় এর কারণ এতে যে ছোট্ট হয়ে যাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সেই সকল পুরুষরা।

‘ধর্ষণ’ শব্দটি সাম্প্রতিককালে বারবার ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। ‘ধর্ষণ’ অরণ্যের মাঝে, লোকালয়, পুলিশ থানায়, রাজনীতি গহ্বরে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা বাঙালিরা একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। তবে একটা ভরসার কথা এই যে, ধর্ষিতা মেয়েরা এগিয়ে এসে বলতে পারছেন যে তিনি ধর্ষিতা। ধর্ষণ যে একটা শারীরিক আক্রমণ, এর সঙ্গে নারীর ‘পবিত্রতা’ চিরকালের মতো নষ্ট হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই, এই বোধটাও কিন্তু সম্ভব হয়েছে মেয়েদের দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। একের পর এক আইনি লড়াই লড়তে গিয়ে তাঁদের শুনতে হয়েছে মেয়েটির চরিত্র খারাপ ছিল। শারীরিক প্রমাণ নাকি বলে, একটা স্তরের পরে মেয়েটা নাকি ‘সম্মতি’ দিয়েছিল।

রক্ষক প্রায়শই ভক্ষক হওয়ার জন্য মেয়েদের লড়ে গিয়ে বলতে হয়েছে, থানায় মেয়ে পুলিশ না থাকলে সেই লক-আপে মেয়েদের রাতে রাখা যাবে না। এমনকী ধর্ষিতা মেয়েদের বোঝাতে হয়েছে যে ধর্ষিতা হওয়া মানেই জীবন শেষ হয়ে যাওয়া নয়। বলতে হয়েছে, ধর্ষণের সময় ঠিক কী হয়েছিল সেটা আদালতে বলতে বাধ্য করে সমবেত শিরশিরানি এবং মেয়েটির যন্ত্রণাকে বাড়ানো যাবে না। এই অকল্পনীয় কঠিন আন্দোলন কিন্তু এগিয়েছে, এগিয়ে চলেছে, কারণ প্রাণের মায়া ছেড়ে, সব ভয় ভুলে ১৬ বছরের মথুরা আর ২৫ বছরের বাইয়ের মতো মেয়েরা লড়ে গেছে। আরও অনেক মেয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

বারবার এও প্রমাণিত হয়েছে যে ধর্ষণ কেবল বাড়ির বাইরে হয় না, কেবল অপরিচিত পুরুষেরা করে না। বাড়ির ভেতরে, চেনা মানুষটির কাছেও কোনও নিরাপত্তা নেই। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নারীদের ওপর অত্যাচার এক বড় সমস্যা। নারীকে সমাজের সম্পত্তি হিসেবে দেখার বিরুদ্ধে আন্দোলন নারী আন্দোলন-এর একটা বড় দিক। আজও আমাদের দেশে লক্ষ কোটি কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, নিয়মিত। নারী আন্দোলনের একটা স্লোগান আছে—

“আমি সেদিন নারীবাদী থাকব না, যেদিন এই সমাজ আর পুরুষতন্ত্রী থাকবে না”। —সেদিন আজও আসেনি। অবাক পৃথিবীর অবাক কাণ্ড! বড় বিচিত্র এই জগৎ। দিনে দুপুরে যারা নির্জলা থেকে দশ হাতে বেগার খেটে মরে, রাতে তারাই শয্যাসঙ্গিনী হয়। পরিণামে পায় শুধু অবহেলা। কবে দূর হবে এই তমসা? কবে দেখবে তারা আবার নতুন প্রভাত? যখন তাদের স্বাধীনতার মানেটা পাল্টে যাবে। নিজেকে নতুন করে নতুন ভাবে চিনবে। নতুন করে বাঁচতে শেখার স্বাদটা কবে পাবে? এই জীবনকে শেষ করে নয়, এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাবে। পথে থাকবে না কোনও ভয়, শুধুই পাবে জয়। কিছুদিন আগেই গেল ৮ মার্চ— বিশ্ব নারী দিবস। শুধু মোবাইলের ৩টি শব্দ সমষ্টি Happy Womens Day এটিতেই শুধু নয়। নারীদের জেগে উঠতে হবে। এবং পুরুষদেরও সমানভাবে এই লড়াইয়ে নারীদের পাশে থাকতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলা যায় যে— পাখি উড়তে গেলে দুটো ডানাই যেমন সচল রাখা দরকার, তেমনই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে নারী পুরুষকেও সমানভাবে অগ্রসর হতে হবে। তাহলে হয়তো পুরুষরা অনেকটা সম্মানীয় হয়ে উঠবে নারীদের চোখে। শুধু প্রবন্ধ, ফিচার, আর্টিকেল বা পত্রিকার প্রতিবেদন পড়লেই হবে না। নিজেদের মধ্যে নিভে থাকা আগুনটা জ্বালাতে হবে। হয়তো এই প্রতিবেদন লিখে সেই শেষ হয়ে যাওয়া করুণ মুখগুলোর দুঃখ মোচন করতে পারা যাবে না, কিন্তু তাদের দুঃখ যে শুধু তাদের নয়, তা সমগ্র নারী-পুরুষদের দুঃখ। এই সহজ সত্যি কথাটি যদি সবাইকে বোঝানো যায় তাহলেই এই লেখার সার্থকতা। ভয়কে জয় করে যে সকল নারীরা এগিয়েছেন তাদেরকে আমাদের কুর্নিশ। আমরা আছি তাদের পাশে। আমরা ছিলাম, আমরা থাকব।

“মুক্ত করো ভয়!
আপনা মাঝে শক্তি ধরো
নিজেরে করো জয়!”

খোলা চিঠি

আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে চোরের উপদ্রব, শঙ্কিত সিপিএম নেতারা

আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ,

পরিবর্তনের বর্ষপূর্তিতে আপনাদের অভিনন্দন। এবার আপনাদের কাছেই চিঠি পাঠাচ্ছি। কারণ, এই চিঠির মধ্যেই আছে আর একটি চিঠি। সে চিঠির পিছনে আবার একটা গল্প আছে। গুল+গল্প=গুল্প নয়, সত্যি কথা। বিশ্বাস করতে হয় করুন। না হলে আমার বয়ে গেল।

দিন কয়েক আগে আমার এক কাগজ কুড়ুনি বন্ধু একটি আস্ত চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছেন। তাঁর কথামতো চিঠিটা পাওয়া গেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে। একেবারে সিপিএম সদর দফতরের সামনে। চিঠিটি পেয়েই তিনি আমার কাছে ছুটে আসেন। আমাকে দিয়েও গেছেন সেটা। আমি সেই চিঠিটিই আপনাদের জন্য তুলে ধরছি।

মাননীয় নগরপাল
কলকাতা মহানগর
মহাশয়,

তস্করের নিদারুণ উপদ্রবে আমরা তিষ্ঠতে পারিতেছি না। যথা শীঘ্র সম্ভব আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে আমরা সর্বস্বান্ত হইবার ভয় করিতেছি। পরিস্থিতি যেই দিকে আগাইতেছে তাহাতে অচিরেই আমাদিগকে পথে বসিতে হইবে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের কামনা করি।

আপনি হয়তো ভাবিবেন, সর্বহারার আবার হারাইবার কী বা আছে? শিকলটুকুই তো সম্বল। কিন্তু না, আমাদিগের হারাইবার কিছু না থাকিলেও খোয়াইবার অনেক কিছুই আছে। যাহার অনেকটাই এখন তস্করদের পকেটস্থ। জবরদখল হইয়া গিয়াছে, হইয়া যাইতেছে। যেটুকু যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা আমরা দিবারাত্র বুকে আগলাইয়া বসিয়া আছি। আহার নিদ্রা ভুলিয়াছি। পার্টির দৈনন্দিন কাজকর্ম ডকে উঠিয়াছে। সুশান্ত বা লক্ষ্মণের ন্যায় কারাবাস না হইলেও আমরা পার্টি অফিসেই বন্দী হইয়া ঘানি টানিতেছি। আমাদের চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। চিন্তায় চিন্তায় মস্তক কেশ শূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। আর সহ্য করিতে না পারিয়াই আপনার কৃপাপ্রার্থী হইয়াছি। এক্ষণে আপনি ব্যবস্থা না লইলে আমাদের ভিক্ষার ঝুলিও তস্করের করায়ত্ত হইবে।

আজি হইতে এক বৎসর পূর্বে আমাদের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। আমাদের দেবতা (শ্রীশ্রী মার্কস ও লেনিনদেবের পর) জনগণের ওপর ভরসা রাখিয়া জনগণের রায় মানিয়া লইয়াছিলাম। সেই দুঃসময়ের অনেক আগেই আমাদের কৃষক শক্তি চুরি গিয়াছিল। সিঙ্গুরে সিঁদ কাটিয়া তস্করেরা একে একে সর্বস্ব হাতাইয়া লয়। শ্রমিক শক্তিতেও চক্ষুদান করিয়াছিলেন তস্করকুল। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের মহাপবিত্র মহান 'মে দিবস' চুরি হইয়া গিয়াছে। এ কোনও ছিঁচকে চোরের কর্ম নহে। রীতিমতো দিবালোকে, সর্বসমক্ষে শ্রমিক দিবসে ভাগ বসাইয়াছে উহারা। শিকাগো শহরে রক্তে রাঙা লাল পতাকার বদলে জাতীয়তাবাদী ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা পত পত করিয়া উড়িয়াছে রাজ্যের আকাশে। তাহা দেখিয়া আমাদের বুক হু হু হু হু করিয়া জ্বলিয়া গিয়াছে। মাথা বন বন করিয়া ঘুরিয়াছে। চক্ষে সরিষা ফুল দেখিয়াছি। গোটা দলকে ডিফেন্সে দাঁড় করাইয়াও কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে দেখিয়াছি তস্করেরা একের পর এক কন্দুক (ফুটবল) আমাদিগের গোলে পাঠাইয়াছে। গোলরক্ষককে ভূপতিত করিয়া গোলের জাল ছিন্ন করিয়াছে। এরপর আর রক্ষা নাই বুঝিয়াই কমরেড ঋত্বিক ঘটকের ডায়লগ ধার করিয়া আপনার দ্বারে আমাদিগের প্রার্থনা। 'দাদা...আমরা বাঁচতে চাই'...

আমাদিগের আর যাহা যাহা গত এক বছর কালে খোওয়া গিয়াছে তাহার একটি তালিকাও প্রস্তুত করিয়া দিলাম।

১। সাধারণ মানুষ ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের নিকট হইতে তোলা বা পার্টি-কর আদায়ের কায়দা। ২। বিনা ভোটে কলেজ ইত্যাদি দখলের গবেষণালব্ধ ফর্মুলা। ৩। অধ্যাপক হইতে অটোচালক সর্বস্তরের মানুষকে একইভাবে আঙুল তুলিয়া হুমকির অভ্যাস। ৪। শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা, বুদ্ধিজীবীদের বগলদাবা করিবার মার্কসীয় তত্ত্ব। ৫। সরকারকে দলের পৈত্রিক প্রপার্টি হিসেবে পরিচালনা করার মনস্তত্ত্ব। ৬। সংবাদমাধ্যমকে যথেচ্ছ গালিগালাজ, প্রয়োজনে বল ও ভয় প্রদর্শনপূর্বক নিজ লাইনে আনয়ন।

মহাশয়, এছাড়াও স্বজনপোষণ, মুসলিম তোষণ, মিথ্যা আশ্বাস, কেন্দ্রের সঙ্গে দরাদরি ও চাপ প্রদর্শন প্রভৃতি বহু বিষয়ে এ রাজ্যে আমদিগেরই একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। লোকে বলিত, এসব ব্যাপারে আমাদের ছবি ও সই দেখিয়াই ভেজাল কিনা তাহা যাচাই করা যায়। কিছু কিছু বিষয়ে আমরা পেটেন্টের আবেদনও করিয়াছিলাম। ব্যালট বক্সে সব ভোট নিজেদের পক্ষে বদলাইয়া দেওয়ার জাদুবিদ্যা, ধর্ষণ হইতে শিশুমৃত্যু বিষয়ে 'এমন তো কতই হয়' টাইপের ডায়লগ সকলই একটু একটু করিয়া চুরি যাইতেছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সলিল চৌধুরী মায় সুকান্ত ভট্টাচার্যও তস্করদের হাতে।

এমনকী হুজুর, আমরাই যে রাজ্যের মুসলিম জনসংখ্যা তিল তিল করিয়া বাড়াইয়াছি সেই স্বীকৃতিটুকুও লোপাট করিয়া দিল তস্করেরা। ইদানীং তাহারা বুক ফুলাইয়া দাবি করিতেছে তাহারাই রাজ্যকে দেশের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যার বিচারে এক নম্বরে লইয়া গিয়াছে।

এহেন পরিস্থিতিতে মাননীয় নগরপাল ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমরা মহান 'মে-দিবস' চুরি যাওয়ার পর রীতিমতো চিন্তিত আগামী নভেম্বর মাসটি লইয়া। 'মহান নভেম্বর বিপ্লব'ও যদি তস্করেরা দখল করে তবে আমার কী লইয়া আর বাঁচিব? আবারও বলিতেছি, 'দাদা...আমরা বাঁচতে চাই'...

ইতি, ভবদীয়—

পাঠক পাঠিকাগণ, চিঠিটা এতটুকুই ছিল। কোনও স্বাক্ষর ছিল না। কোনও রকম পরিবর্তন না করেই পেশ করলাম। হয়তো এটি মূল চিঠির ড্রাফট তৃণমূল চিঠি। নগরপালের কাছে পাঠানো হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। আপনারা জানাতে পারলে জানাবেন প্লিজ।

ভাল থাকবেন। তস্কর হতে সাবধানে থাকবেন।

— সুন্দর মৌলিক

একইসঙ্গে কীভাবে সমাধান হবে সন্ত্রাসের মোকাবিলা আর মানবিক অধিকার রক্ষা?

অতিথি কলম

ডঃ সুব্রমানিয়াম স্বামী

মানবিক অধিকার হলো প্রাথমিক অধিকার। আর ভারতে স্বাধীনতা রয়েছে যে কোনও নাগরিকের। প্রাথমিক অধিকার হলো জীবনের, স্বাধীনতার, সমানতার, বিচারের। সেইসঙ্গে চিন্তা ও প্রকাশের।

সন্ত্রাস তিনভাবে ক্ষতি করে মানবিক অধিকারের। সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে নাগরিক জীবন বিপন্ন হয়। প্রাণ যায়, অঙ্গহানি হয়, সম্পদ নষ্ট হয়। সেইসঙ্গে নাগরিক অধিকারও।

এই সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলার জন্যে আমরা নাগরিকদের মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রেও কিছু বিধিনিষেধ প্রয়োগ করেছি। গোপনীয়তা থাকছে অনেক ব্যাপারে। স্বাধীনভাবে ভ্রমণ আর যে কোনও মানুষের সঙ্গে কথা বলার বিপদ আমরা বিভিন্ন সময়ে বুঝেছি তার মাশুল দিয়ে।

মানবিক অধিকারের প্রশ্ন তখন অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে যখন সন্ত্রাসবাদীরা অত্যাচার চালায়। মানবিক বঞ্চনা বাড়ে। সন্ত্রাসবাদীদের বিচারের সময় মানবিক অধিকারের কথা বারবার আসে।

যে কোনও গণতান্ত্রিক সমাজে মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে হয় যখন সমাজ দখল করে খুনি সন্ত্রাসবাদীরা। তখন কীভাবে মানবিক অধিকার রক্ষা করা সম্ভব এই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে?

১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ মানবিক অধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণা পেশ করেছিল। আন্তর্জাতিক মানবিক অধিকার আইন রূপ নেয় অনেকরকম শাখা প্রশাখায় বিন্যস্ত চুক্তি ও আইনের কাঠামোয়। এইসব চুক্তির মধ্যে ছিল ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। সেই সঙ্গে ছিল আন্তর্জাতিক মানবিক ও রাজনৈতিক অধিকার যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল পারস্পরিক সম্বন্ধ।

ভারত এই নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়েছে একদশক বাদে। ১৯৭৭-৭৯ সালে জনতা দল ক্ষমতাসীন থাকার সময় মানবিক অধিকার কোথায় কীভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে তা নিয়ে অনুসন্ধান করা হবে— সরকারি তরফে ঘোষণা ছিল।

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণ পরিষদে গৃহীত হয় ভারতীয় সংবিধান। তাতে বলা হয়েছিল মানবিক অধিকার হবে প্রাথমিক অধিকার।

যদিও ভারতের সংবিধানে সমস্ত মানবিক অধিকারে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিছু বিধিনিষেধ-সহ ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও। এই বিধিনিষেধ পর পর সাজানো হয়নি।

ভারতে মানবিক অধিকারের আইন রয়েছে যা সকলকে বাধ্য হয়ে মানতে হয়।

ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রাথমিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। নাগরিকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা

> “মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিসেবে সমস্ত অধিকারের দাবি জানায়। কিন্তু তারা অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবি স্বীকার করে না, ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও নয়। যেসব মুসলমান দেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু সেখানে ধর্মাচরণের ও অন্যান্য অধিকার কি মেলে?”

হলো সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব।

রাষ্ট্র মানবিক অধিকারকে নিশ্চয়তা দেয়। সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ থেকে স্বদেশের নাগরিক ও অন্যদের রক্ষার দায়িত্ব থাকে। আর সেসব ক্ষেত্রে তারা যাতে সুবিচার পায় তা দেখাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ ২০০৭ সালে তার ১৫৬৬ নম্বর সিদ্ধান্তে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে বলে, 'অপরাধমূলক কাজ, যা নাগরিকের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়, যা সন্ত্রাসের আবহাওয়া আনে সাধারণ মানুষের মধ্যে। একদল মানুষ বা কোনও একজন এসব জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ করে জীবনকে বিপন্ন করে। সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা এসব কাজে বাধা দেওয়ার উদ্যোগ নেবে।'

মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসে এর থেকে, মানবিক অধিকারের দুটো দিক কতটা নিয়ন্ত্রিত হবে? স্বাধীনতার অধিকার আর নিরাপত্তার অধিকার দুই-ই মানবিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

মানবিক অধিকারকে কতটা ত্যাগ করা সম্ভব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে লড়াই চালাবার জন্যে? আর সেক্ষেত্রে কোন্ বিভাজন নীতি নেওয়া যেতে পারে?

আর এই ভাবনা ঠিক নয়, আমরা মানবিক অধিকার রক্ষাকে যত কম গুরুত্ব দেব তত বেশি লড়াই চালানো যাবে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে। আবার এর উল্টো ভাবনাও যথাযথ নয়।

সবক্ষেত্রেই সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণে একটা স্তর আছে। এক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে ফল মেলে।

বলতেই হয় আমরা যত মানবিক অধিকার হারাবো ততই সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে পারবো।

গণতান্ত্রিক সমাজে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করা দরকার যুক্তিপূর্ণ ত্যাগ ও নিয়ন্ত্রণ— সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার তাগিদে। আর যখন তাকে ব্যাপকভাবে নেওয়া হয় তখন শুরু হয় সন্ত্রাসবাদের মুখোমুখি হওয়া।

সব দেশেই এখন এসব কথা ভেবেই মানবিক অধিকার সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। কারণ অধিকার অবাধ হলে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা কঠিন হবে। তাই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা গুরুত্ব পাবে, না প্রাথমিক নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যাপার?

ভারত এখন পৃথিবীর সব থেকে বেশি সন্ত্রাসবাদ-আক্রান্ত দেশ। আর বড়রকম আঘাত আসছে ওয়াহাবি মুসলমানদের কাছ থেকে। যারা যে কোনও ভাবে ভারতে ইসলামি প্রভাব বিস্তারের জন্যে জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

এক সময় আমি একটি সংবাদপত্রে লিখেছিলাম, 'কীভাবে ভারত থেকে ইসলামি সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব।' তাতে কৃত্রিম ক্রোধের প্রকাশ দেখেছিলাম মুক্তমনা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের রক্তাক্ত হৃদয় থেকে। নব্য-নেহরুপন্থীরা রুষ্ট হয়েছিলেন আমি এক তুলিতে ইসলামি সন্ত্রাসকে রঞ্জিত করার জন্য।

আমরা যেমন নাৎসী আমলের জার্মানির সব জার্মানকে এক ছাঁচে ফেলে দেখি না, তেমনি সব মুসলমানকে একভাবে দেখি না। সুফি, শিয়া, আহমেদিয়া মুসলমানরা অন্যরকম। তারা স্বীকার করে তাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিল।

বাস্তবে? সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে হিন্দু আর মুসলমানদের একই ডি এন এ-গত গঠন। যাঁরা এই সত্যকে গ্রহণ করবেন তাঁরা মানবেন হিন্দুরা সন্ত্রাসবাদী নয়। তারা বৃহৎ হিন্দুত্ব পরিবারের অংশ। হিন্দুরা আগ্রহের সঙ্গে মুসলমানদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে কথা বলেছে, যেহেতু তারা এক পরিবারের সদস্য।

ভারতের ওয়াহাবি সুন্নি মুসলমানরা মৌলবাদী, ওরা এই বাস্তবকে স্বীকার করে না। তারা মনে করে আরব সংস্কৃতির লোক এবং গজনী ও ঘোরির উত্তরসূরী। সত্য হিন্দুরা ওইরকম নির্মমতার জন্যে প্রস্তুত নয়। ভারতের জমিতে যে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হচ্ছে এইসব উগ্রগোষ্ঠী তার মদতদাতা।

মৌলবাদী ওয়াহাবি মুসলমানরা রাজনৈতিক দিক থেকে একেবারে অন্যরকম।

প্রথম আত্মবিরোধী সত্য, এই মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিসেবে সমস্ত অধিকারের দাবি জানায়। কিন্তু তারা অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবি স্বীকার করে না, ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও নয়। যেসব মুসলমান দেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু সেখানে ধর্মাচরণের ও অন্যান্য অধিকার কি মেলে? যেমন সৌদি আরবে হিন্দুরা মন্দির গড়তে পারে? দীপাবলীর অনুষ্ঠান করার সুযোগ আছে? শ্রীরামের ছবি পকেটে নিয়ে ঘুরতে পারে?

দ্বিতীয় আত্মবিরোধী সত্য, ওয়াহাবি মুসলমানরা যেখানে সংখ্যাগুরু সেখানে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ দেখে না। যেমন তারা মসজিদ ভাঙার নির্দেশ দেয়। কারণ মসজিদে লোকে প্রার্থনা করে। মসজিদের বদলে রাস্তা তৈরি হলো জরুরি।

তৃতীয় আত্মবিরোধী সত্য, কয়েকটি দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠরা যখন একত্রিত হয়েছে তখন সংখ্যালঘুদের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। সংখ্যাগুরুরা একত্রিত না হলে সংখ্যালঘুদের অধিকার গুরুত্ব পায়নি। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় যখন সংখ্যাগুরু খৃস্টানরা একত্রিত হয়েছে তখন মুসলমানরা একই সামাজিক আইন মেনেছে। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু হলেও মুসলমানরা একই রীতি নিয়ম আইন মানতে চায়নি।

চতুর্থ আত্মবিরোধী সত্য, অমুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার জন্যে মুসলমানরা যথেচ্ছ অত্যাচার চালায়। বাংলাদেশে আর কাশ্মীরে অমুসলমানদের ধর্মীয় জেহাদের মাধ্যমে অপসারণের চেষ্টা চালায়। অমুসলমান সংখ্যাগুরুরা যখন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে তখন তারা উগ্রভাবে প্রতিবাদ জানায়।

এই চার ধরনের মৌলবাদীকে মনে রাখতে হবে আমাদের ইসলামি সন্ত্রাসের মোকাবিলা ও মানবিক অধিকার রক্ষার জন্যে। আর তাতে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাবে ইসলামি সন্ত্রাসের মোকাবিলার জন্যে।

(লেখক : প্রাক্তন আইনমন্ত্রী, হিন্দুত্ববাদী প্রচারের সপক্ষে সক্রিয় আন্দোলক।)

সৌজন্য : অর্গানাইজার প্রজাতন্ত্র দিবস সংখ্যা ২০১২

নোট বুকের রাইটার চাই

নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ডিগ্রিকোর্স (কল্যাণী, গৌড়, বর্ধমান) ও চাকুরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাজেশন ভিত্তিক বই লেখার জন্য রাইটার চাই। যোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে শীঘ্র এস. এম. এস. করুন। ৯৮৩২০৪৩৫১৫, ৯৭৩৫৯৪৮৭৯০

ডাইনি সন্দেহে খুনের ঘটনা বাড়ছে মালদায়

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ মালদা জেলার তিনটি আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লক গাজোল, হবিবপুর ও বামনগোলাতে ডাইনি সন্দেহে খুনের ঘটনা বেড়ে চলেছে। কিছুদিন আগে গাজোল ব্লকের রঘুনাথপুর গ্রামের সত্তর বছরের বৃদ্ধা পেকলে হেমব্রম ডাইনি অপবাদ নিয়ে ৬ মাস ধরে গ্রামছাড়া হয়েছিল। বৃদ্ধাকে গ্রামে ফেরাতে পুলিশ ও প্রশাসনের ঘাম ছুটে গিয়েছিল। তাছাড়া হবিবপুর ব্লকের বাসিন্দা হুপানি সোরেনকে গ্রামে ফেরাতে পুলিশ প্রশাসন গ্রামে সভা করে। জানা গেছে হুপানি সোরেনকে বেশ কিছুদিন আগে তার ছেলেই ডাইনি অপবাদ দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এদিকে গত ২৩ এপ্রিল রাতে হবিবপুরের তিলাসন গ্রাম থেকে মা মেয়েকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ অভিযোগ পায় ৪৯ বছরের যশোমতী রায় ও তার ১৭ বছরের মেয়ে শংকরী রায়কে ডাইনি সন্দেহে পিটিয়ে মারার প্রস্তুতি চলছে গ্রামে। পুলিশ সুপার জয়ন্ত পাল বলেন, ২২ এপ্রিল গভীর রাতে খবর আসে যে তিলাসন গ্রামের এক পরিবারে মা ও মেয়েকে ডাইনি সন্দেহে মেরে ফেলার চক্রান্ত হচ্ছে। রাতেই ওই দুইজনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। কোর্টের নির্দেশে তাদের বর্তমানে সরকারি হোমে রাখা হয়েছে। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, ওই দুই মহিলার প্রতিবেশীর তিন মাসের ছেলে সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুখ না কমায় সেই ছেলের মা ফরমান দেয় যে ওই মহিলা ও তার মেয়ে ডাইনি। তাই তার ছেলের অসুখ কমছে না। এই খবর গ্রামে রটে যায়। অভিযোগ, তারপর ওই দুই মহিলাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে মেরে ফেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। পুলিশ সময়মতো দুজনকে উদ্ধার না করলে বেঘোরে দুটো প্রাণ চলে যেত। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে যে মালদা জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত গাজোল ব্লকেই ডাইনি সন্দেহে খুন ও গ্রামছাড়া করার সবচেয়ে বেশি অভিযোগ রয়েছে।

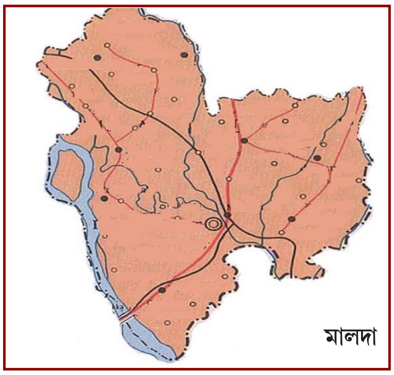

এছাড়া হবিবপুর ও বামনগোলা ব্লকেও এমন ঘটনা ঘটেছে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে গাজোলের ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১১টি জনজাতি বা বনবাসী অধ্যুষিত। ২০০১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী এই ব্লকে মোট অধিবাসীর ৭০ হাজার জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। এই ব্লকে পিছিয়ে পড়া গ্রামের সংখ্যা ১০৩টি। গত এক বছরে গাজোল ব্লকে ডাইনি সন্দেহে দু'জন খুন হয়েছেন। তাঁরা হলেন তালা হেমব্রম (৬৫) ও পাইকু মর্মু (৭৮)। তালা হেমব্রমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এবং পাইকু মর্মুকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। ডাইনি অপবাদে গ্রাম থেকে ৮ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা এখনও গ্রামে ফিরতে পারেনি। গাজোল ব্লকের বিডিও বলছেন, ডাইনি প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। আইনের শাসন দিয়ে এর সমাধান সম্ভব নয়। আদিবাসী সমাজেরই শিক্ষিত মানুষদের এই কুসংস্কার ভেঙে সঠিক পথে আনতে হবে। প্রশাসনের একাংশ বলছে,গাজোলে বেহাল স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থাই সমস্যার জন্য দায়ী। অশিক্ষার জন্য বনবাসী সমাজে কুসংস্কার এখনও যথেষ্ট মাত্রায় রয়েছে। জনজাতিরা চিকিৎসার জন্য এখনও জানগুরু, ওঝা বা গুণিনদের ওপর যথেষ্ট নির্ভর করে। তাই তারা কাউকে ডাইনি বলে ঘোষণা করলে সমাজের অধিকাংশ মানুষ তা মেনে নেন। তাছাড়া বনবাসী সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী লোক ডাইনি প্রথার সুযোগে অন্যের সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বিডিও জানিয়েছেন, আগামীদিনে জনজাতি সমাজের শিক্ষিত জনজাতি যুবক-যুবতীদের সঙ্গে নিয়ে প্রশাসন ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করবে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পক্ষ থেকে এই ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে সমাজকে জাগ্রত করতে স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সামাজিক ব্যাধি নির্মূলের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ মালদা জেলার পক্ষ থেকে স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষে সমাজের পিছিয়ে পড়া জাতিকে পথ দেখাতে ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে সচেতন করার ব্যবস্থা নিয়েছে।

আর একটি ঘটনায় ২৫ এপ্রিল বামনগোলা থানার মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালজয়ী হঠাৎপাড়া গ্রামের মানিক লোহারকে পুলিশ উদ্ধার করে। অভিযোগ ওই ব্যক্তিকে সেখানে ডাইন সন্দেহে বলি দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। নিরঞ্জন লোহার এবং তার দুই ছেলে এদিন গভীর রাতে কৃষিজীবী মানিক লোহারকে ডাইনি চিহ্নিত করে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিরাট খাঁড়া দিয়ে বলি দিতে যাচ্ছিল। ঠিক সময়ে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে এবং অভিযুক্তদের ধরে ফেলে। বামনগোলা থানার ওসি পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, নিরঞ্জন লোহার এবং তার দুই ছেলের বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। উদ্ধার হওয়া খাঁড়াটি পুলিশ হেপাজতে রয়েছে। গোপালজয়ী হঠাৎপাড়া গ্রামের বাসিন্দা তথা অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার গোঁসাই দাস মণ্ডল বলেন, কয়েকজন মাতব্বর গ্রামে কুসংস্কার ছড়াচ্ছে। ঘটনার প্রতিবাদ করায় আমি এক প্রকার সামাজিক বয়কটের শিকার হয়েছি। মানিকের পরিবার রীতিমতো আতঙ্কিত, তাকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে, তাঁরা গ্রামে থাকতে চাইছেন না।

মুসলিম লীগের পঞ্চম মন্ত্রিত্ব
ইসলামীকরণের পথে কেরল ?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাজ্যের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশই হিন্দু, অথচ রাজ্যের মন্ত্রিসভা ও সমপর্যায়ের ২৪ সদস্যের মধ্যে ১৪ জনই মুসলমান ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের। উদ্ভুত এই পরিস্থিতি কেরলকে দ্রুত ইসলামীকরণের দিকে নিয়ে যাবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের আশঙ্কা। বিশেষ করে 'প্রেম-জেহাদ'-এর মধ্য দিয়ে কেরলে নিঃসাড়ে যে ইসলামীকরণের সূচনা হয়েছিল কয়েকবছর আগে তারই স্পষ্ট প্রতিফলন এখন কেরল মন্ত্রিসভায় দেখা যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রেম-জেহাদ কর্মসূচীতে মুসলমান প্রণয়প্রার্থী যুবকরা ইসলামীকরণের জন্য মূলতঃ হিন্দু- মেয়েদেরই 'টার্গেট' করত। ফলে কেরলের বিভিন্ন হিন্দু-সমাজ যেমন নায়ার-গোষ্ঠীর এন এস এস (নায়ার সার্ভিস সোসাইটি), এঝাভা গোষ্ঠীর এস এন ডি পি এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিজেপি, এ বি ভি পি-র মতো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির মধ্যে থেকেই প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। আর সেই প্রতিবাদে পরে চার্চ যোগ দেয়। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণে চার্চ মুসলমানদের পক্ষে চলে যেতে পারে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা।

আর সেক্ষেত্রে কেরল যে ইসলামীকরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রের দাবী উঠবে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মার্চে চূড়ান্ত দরাদরির পর গত ১২ এপ্রিল মুসলিম লীগের মানজালামকুঝি আলি দলের পঞ্চম মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এবং তাঁর শপথ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য বিঘ্নিত হলো বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। ভেন্টিলেশনে চলে যাওয়া নিজের সরকার বাঁচাতে (৭২-৬৭ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায়) কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ওমেন

'শপথ' নিচ্ছেন মানজালামকুঝি আলি।

চণ্ডী যেভাবে মুসলিম লীগের কাছে ভোট ভিক্ষে করেছেন সেটাকে 'রাজনৈতিক হারাকিরি'র পর্যায়েই ফেলছেন রাজনৈতিক মহল। শঙ্কা বাড়িয়েছে, সম্প্রতি চার্চের উস্কানিতে জনজাতি এলাকা থেকে উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী কংগ্রেসের অনুপ জ্যাকব, আলির সঙ্গেই শপথ নেওয়ায়।

এই ঘটনায় কংগ্রেসের মধ্যেই ফাটল ধরেছে। সর্বজন পরিচিত কংগ্রেস নেতা ও কেরল বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিধায়ক ভি এস সুধীরন, কে করুণাকরণের পুত্র কে. মুরলীধরন এবং মন্ত্রী আরিয়াদান মহম্মদ ওই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি।

দেশভাগের স্মৃতি উস্কে তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁরা মন্তব্য করেছেন, চাঁদ-তারা আঁকা মুসলিম লীগের সবুজ পতাকার কাছে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা আত্মসমর্পণ করেছে।

কেরল বিধানসভায় এই মুহূর্তে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা ২১ এবং তাদের দাবি অনুযায়ী ৫টি মন্ত্রিত্ব-ই দেওয়া হয়েছে। এই কাজটা যে কতটা নিন্দনীয় হয়েছে তার প্রমাণ সিপিএমের পরস্পরবিরোধী কেরলের দুই শীর্ষ নেতা ভি এস অচ্যুতানন্দন এবং পিনারাই বিজয়ন, যাঁরা এতাবৎকাল মুসলিম তোষণ নীতির বিরোধিতা তো করেনইনি বরং উল্টে সমর্থন করেছেন, তাঁরাও লীগের পঞ্চম মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এবং ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ বলে বর্ণনা করেছেন। রাজ্যকংগ্রেস সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রমেশ চেন্নিথালা-কে অন্ধকারে রেখে ওমেন চণ্ডী এই নীতিহীন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তবে ওমেন চণ্ডীর এই 'দুঃসাহসে'র পেছনে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের অভয়দান রয়েছে বলে কং-মহলেই ফিসফাস শোনা যাচ্ছে।

নিজামশাসিত হায়দরাবাদের ভারতে বিলয় : এক অকথিত কাহিনী

রাধাকান্ত বিশ্বাস

সারা ভারতের মিলন ক্ষেত্র জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর (এন সি সি) অফিসার ট্রেনিং স্কুল (O.T.S) ক্যাম্প। এই স্কুলে বৎসরের প্রায়ই সব সময় ট্রেনিং নেন সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা ভাষাভাষীর শিক্ষক ও অধ্যাপক যারা জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর অফিসার। কোনও ব্যাচ্ রিফ্রেসার কোর্স করেন, কোনও ব্যাচ প্রি-কমিশন ট্রেনিং করেন।

এ হেন তীর্থক্ষেত্রে যাবার বাসনা অনেকদিন থেকে। হঠাৎ সেই সুযোগ এসে গেল। সুতরাং সন্ধ্যা ৭টায় বম্বে মেল ভায়া নাগপুর ট্রেনে চড়ে গেলাম। ঠিক ১ অক্টোবর ১৯৬১ অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল ক্যাম্পে প্রবেশ পুস্তকে সই করলাম। তখন বেলা ১২টা।

এখন আর আমি একা নয়, প্রায় পাঁচশতজন ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকরা হাজির। প্রথম পরিচয়ের ধাক্কা সামলান দায়— আমাদের স্থায়িত্ব ৩০ দিন। রুটিন অনুযায়ী অভ্যাস চলছে শস্ত্রশিক্ষা, ফিল্ডক্রাফট্, ম্যাপ রিডিং, মার্চিং ইত্যাদি। একদিন হঠাৎ শুনলাম আমাদের সাউদার্ন কম্যান্ডের জি ও সি ইন সি মেজর জেনারেল জে এন চৌধুরী ক্যাম্পে আসছেন এবং আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেবেন। সেই মতো আমরা দুপুরে লাঞ্চের পর টিপ্‌টপ্ ইউনিফর্ম পরে লেকচার হলে সমবেত হলাম। সঠিক সময়ে তিনি আমাদের সামনে প্লাটফরমে এসে দাঁড়ালেন। প্রথমেই তাঁকে অনুরোধ করা হলো ১৯৪৮-এর হায়দ্রাবাদ অভিযান সম্বন্ধে কিছু বলতে। প্রশ্ন শুনেই পিছনে ব্লাকবোর্ডে তৎকালীন হায়দরাবাদ নিজাম রাজ্যের এক মানচিত্র অঙ্কন করলেন। মানচিত্রে সাউদার্ন কম্যান্ডের হেডকোয়ার্টার পুণার অবস্থান দেখিয়ে বলতে শুরু করলেন—

আমাকে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা উপপ্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেরাদুন থেকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তখন রোগশয্যায়। সময়টা

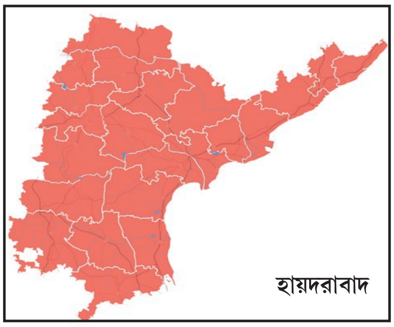

মে মাস ১৯৪৮ সাল। আমাকে দেখেই প্রশ্ন করলেন—

"General, how long will you take ?" আমার উত্তর "Sir, I will take ten days." এর আগে তিনি গোপনে আমাকে ডেকে হায়দরাবাদে এক পুলিশি অভিযানে প্ল্যান করতে বলেছিলেন। আমার এই উত্তর শুনে, তিনি ওই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতে লাগলেন, আমি ওই একই উত্তর দিলাম। তা সত্ত্বেও প্রশ্ন করায়, আমি উত্তর দিলাম, "Sir, if you send me on Monday, I shall return on Saturday and give you a salute". উত্তরে তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং বললেন, "OK General। তুমি পুণায় গিয়ে অপেক্ষা কর, প্রস্তুতি নাও। আমি এখান থেকে খবর পাঠাব।"

শুনেই আমি পুণায় চলে এলাম। হায়দরাবাদ সীমান্তে আর্মি মার্চ করল। প্রথম প্রথম সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল। খবরের কাগজে খুব হৈ চৈ হলো। কিন্তু যখন দেখল যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সীমানা অবধি গিয়ে থেমে আছে তখন সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল। তখন হায়দরাবাদের অভ্যন্তরে খুব গোলযোগ। নিজাম বৃদ্ধ ও রুগ্ন। কাশিম রাজভী ও রাজাকার দল সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। অবস্থা খুবই বিশৃঙ্খল। একতরফা অত্যাচার চলছে। নানা অত্যাচারের কাহিনী শোনা যাচ্ছে। অত্যাচারিতের দল দলে দলে সীমানা অতিক্রম করছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী থাকে ভারতের সীমানার মধ্যে। এদিকের আইনশৃঙ্খলা দেখে। নিজাম রাজ্যের কয়েকটা ছিট্‌মহল ছিল, ভারতের অনুমতি ব্যতিরেকে এই সব ছিট্‌মহলগুলিতে অবাধে যাতায়াত করত ও অত্যাচার চালাত। আপনারা নিশ্চয় সমসাময়িক কাগজে 'কবাডি খেলা' বলে একটা term দেখেছেন। ওই বিখ্যাত কবাডি খেলায় আমাদের সৈন্যরা রক্ষা করত আমাদের অঞ্চল, রাজাকারেরা ছুটে গিয়ে ছিটমহল অঞ্চলে ঢুকে পড়ত। (আমার ব্যক্তিগত মত ওই খেলাটির নাম— জল-কুমির অথবা হিং-এ-দাঁড়ি দিলেই ঠিক হোত)।

ইতিমধ্যে সাংকেতিক বার্তায় (code message) দিল্লীর আদেশ এসে গেল— 'চৌধুরী তোমার পুত্রের উপনয়ন কবে হচ্ছে?' আমি জানালাম, ১৩ই সেপ্টেম্বর। পড়ে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেছিলেন, 'Sir, 13th itself is an unlucky number, why you selected that date ?' আমি গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিলাম, 'a bramhin pundit has selected me that date. It is an auspicious day.' তখন তাদের প্রশ্ন, 'who is that pundit ?' বলা বাহুল্য তিনি নিজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন। তখন আমাদের মধ্যে মৃদু হাস্যধ্বনি উঠল। তিনি আমাদের মৃদু হাস্যে যোগ দেবার পর নিজের প্ল্যানটা বোঝাতে শুরু করলেন। ম্যাপে সোলাপুর, নাগপুর, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর এই চারটি জায়গা চিহ্নিত করে বললেন, 'এই চারদিক দিয়ে আক্রমণ শুরু করা হবে, কিন্তু মেন অ্যাটাকটা হবে সোলাপুরের দিক থেকে। বাকি তিন দিকের আক্রমণ attention divert করার জন্য। তখন আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন, 'আপনি সোলাপুরের দিক থেকে প্রধান আক্রমণের ব্যবস্থা করলেন কেন? এটা রাজধানী হায়দরাবাদ থেকে দূরে এবং মাঝে

একটি নদীর উপর ব্রীজ আছে। তিনি উত্তর করলেন, 'ঠিক এই প্রশ্নই আমাকে প্রেস কনফারেন্স-এ করা হয়েছিল। এই পথটা বেছে নেওয়ার কারণ এখানে রেল পথ ও রাস্তা এই দুই-এর সুবিধা পাওয়া যাবে। খুব বেশি দেরি হলেও পাঁচ দিনের মধ্যে রাজধানী হায়দরাবাদ পৌঁছানো যাবে। বর্ডার থেকে একশ' মাইলের মধ্যে একটা ব্রীজ আছে। এই ব্রীজটা যদি উড়িয়ে দেয় তবে আমাদের অসুবিধা হবে। এটা পূর্বেই চিন্তা করে একজন ব্রিগেডিয়ারের অধীনে রাজপুত রেজিমেন্টকে ব্রীজ রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল।

অপারেশন শুরু করার দু-তিন দিন আগে থেকে রোজ রাত্রি বারোটার সময় ভারতের দিক থেকে হৈ হল্লা করতে করতে ট্যাঙ্ক নিয়ে নিজাম রাজ্যের সীমানা অবধি যেত আবার ফিরে আসত। এই পদ্ধতিকে বলে conditionin করা। সীমানার ওপারের লোকেরা যখন বুঝল এরা রোজ এরকম করে, আসলে এরা নিজাম রাজ্যের সীমানায় ঢুকবে না। তারা নিশ্চিন্ত হলো। এই নিশ্চিন্ততার সুযোগ নিয়ে হলো আমাদের অভিযান। পুণা কন্ট্রোল রুমে বসে অভিযান পরিচালনা করছি। ওয়ারলেসে চার ফ্রন্টের খবর আসছে। প্ল্যান মতো নির্দেশ পাঠাচ্ছি। এমন সময় রাজপুত রেজিমেন্টের থেকে খবর এল sir, will not fight. প্রশ্ন করলাম, কেন? উত্তর এল, 'তারা মেয়ে মানুষ, আমরা মেয়ে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করব না'। বুঝুন আমার মনের অবস্থা! মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বলে পাঠালাম ওরা পুরুষ মানুষ, মেয়েদের পোশাক বোরখা পরে যুদ্ধ করছে। কিছুক্ষণ পরে উত্তর এল— 'হ্যাঁ আমরা যুদ্ধ করছি'। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এই রকম খুঁটিনাটি প্ল্যানের বাইরে ঘটে। সেগুলো সমাধানের জন্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রয়োজন হয়। আরেক দিকে ওই রেলপথ রক্ষার জন্য হাঁটা পথের পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে পাঠানো হয়েছিল। সেদিক অনেকক্ষণ চুপচাপ। কোনও খবর পাচ্ছি না। তারা এগোচ্ছে কি বাধা পেল কিছুই জানা যাচ্ছে না। পরে খবর নিতে জানা গেল তারা ঠিক মতোই এগোচ্ছে। ওয়ারলেস সেটটা একটা বলদের পিঠে ছিল। হামলার গোলমালে সেটি কোথায় পালিয়েছে, খোঁজ চলছে। যাক নিশ্চিন্ত হলাম। এদিকে রাজাকারদের কোনও বিশেষ প্রতিরোধ ছিল না। কাজের সময় কে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। নিজাম সৈন্যবাহিনীতে চরম বিশৃঙ্খলা। নিজামের এক বৃটিশ সেনাপতি ছিলেন। ওই বিশৃঙ্খল অবস্থায় তিনি কর্তব্যে অটল ছিলেন এবং একাই ওই ব্রিজের কাছে মাইন সমেত অগ্রসর হচ্ছিলেন ব্রীজ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমাদের সৈন্যদল তাঁকে পাকড়াও করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আমি তাঁকে খুব ভীতি প্রদর্শন করার পরেও তিনি অনমনীয়। কোনও গোপনীয় তথ্য ফাঁস করতে নারাজ। যখন তাঁকে বলা হলো যে তাঁকে এখানে হত্যা করলেও পৃথিবীর কেউ টের পাবে না, তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমাকে একটা ফটো দেখালেন। তাতে তিনি তাঁর স্ত্রী পুত্র ও কন্যাসহ আছেন। আমারও চোখে জল এল। তাঁকে এসকট দিয়ে সোজা ইংলন্ডের প্লেনে তুলে দেওয়া হলো। পাঁচদিনের মধ্যেই ওই অভিযান শেষ হলো। তৎকালীন জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজি আমার কাছে উড়ে এলেন সর্দার প্যাটেলের এক বার্তা নিয়ে। তাতে তিনি আমাকে ওই রাজ্যের মিলিটারি অ্যাডমিনিস্ট্রেটার নিযুক্ত করেছেন এবং ওই রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নতির জন্য যা প্রয়োজন আমি মনে করি তাই করতে। ''Do whatever you like, I am to explain in parliament।'' একজন শিক্ষক প্রশ্ন করলেন, 'সৈনিকরা এই রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছিল?'

তারা আমাদের দেশের নাগরিক। তাদের প্রতি ভালই ব্যবহার করা হয়েছিল। সৈন্যদল অত্যাচারিত ও দুঃস্থদের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য ও পানীয় বন্টন করেছিল।

এরপর তিনি আমাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন আমাদের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল, এই কথোপকথন প্রেসে না দেওয়ার। কিন্তু আজ তা ইতিহাসের কথা। আজ জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী আমাদের মধ্যে নেই। সর্ব rank প্রিয় জেনারেল টুটু চৌধুরী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ থেকে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। দেশের অখণ্ডতা রক্ষায়, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যখন তাঁর ডাক পড়েছিল, তখনই তিনি সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে জেনারেল থাপারের কাছ থেকে কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন ১৯৬২-র অক্টোবরে চীনা আক্রমণের সময়ে। যখন যখনই বৈদেশিক শক্তির আগ্রাসন, অত্যাচার, আস্ফালন তখনই তিনি ত্রাতার ভূমিকায় এসেছিলেন দেশবাসীর সামনে— তা সে গোয়ার সালাজার সরকারের অত্যাচারেই হোক বা লাল চীনের থাবাই হোক অথবা পাকিস্তানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই হোক। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৬৫ পাকিস্তানের প্যাটন ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে লাহোর অবধি ভারতের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশবাসীর মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়েছিল। আমরা তার স্বর্গগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসের ইটাচুণা শ্রীনারায়ণ বাণী মন্দিরের হীরক জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপনের সময় স্মরণিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ওই উপলক্ষে পত্রিকার সম্পাদক সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায় আমার নিকট লেখা চাইলে আমি উপরোক্ত কথোপকথনটি জমা দিই। কিছুদিন পর সনৎ আমাকে বলল, 'রাধাকান্তদা, আপনার প্রবন্ধটা রাণী প্রেসের সত্বাধিকারী দুলালচন্দ্র সাধুখাঁ ছাপাতে ভয় পাচ্ছেন। বলছেন এখন জরুরী অবস্থা চলছে, এই সময়ে এই ধরনের বিষয় ছাপতে আমি অপারগ। এতে আমার প্রেসের ক্ষতি হয়ে যাবে আপনি অন্য বিষয় লিখিয়ে জমা দিতে বলুন।' আমি তখন বর্ধমান গভর্নমেন্ট কলেজ অফ এডুকেশনে যোগ দিয়েছি। কলেজ কোয়ার্টার্স থেকে সপ্তাহ অন্তে বাড়ি যাই। তখন তাড়াতাড়ি করে 'শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদ কি এবং কেন?' ---এই শিরোনামে একটা প্রবন্ধ জমা দিই। সনৎকে বলি, আমার পূর্ব লিখিত প্রবন্ধটা যেন ফেরত পাই। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ বাদেও বহু তাগাদা দিয়েও সেটা ফেরত পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে হীরক জয়ন্তী পত্রিকা প্রকাশ হলো, উৎসব উদযাপন হলো। সনৎ-এর সঙ্গে দেখা হতে আমার ক্ষোভ জানালাম। সনৎ বলল, লেখাটি দুলালদা নষ্ট করে দিয়েছে। তারপর গঙ্গা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। ক'দিন আগে আমার লিখিত পুরোনো খসড়াটি খুঁজে পাই। ফলস্বরূপ পুনর্লিখন। সেদিন থেকে আরও ৬০ বছরের অধিক পেরিয়ে গেছে। এই কাহিনীর লবকুশেরা স্বর্গগত। এই অতীত গৌরবের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে আমি কৃতার্থ।

(লেখক হুগলী গভর্নমেন্ট বি এড কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক)

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Sabji Mix
kashmiri MIRCH POWDER
Cumin Powder
Turmeric Powder
Chilli Powder
Coriander Powder
Black Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন। — ব্যবস্থাপক

Ori Plast

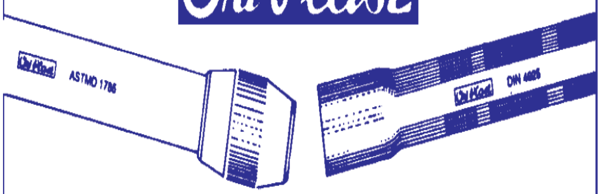

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

নেত্রদান মহাদান

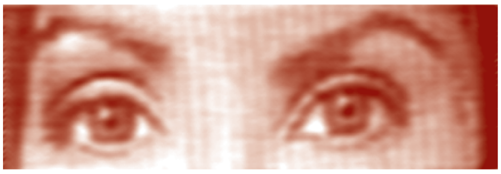

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931

Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

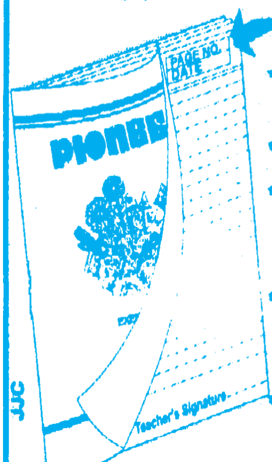

- প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
- পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
- আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
- ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
- ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
- প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature........................ কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®

সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

সমাবেশ সমাচার

সঙ্ঘের মোলবনা শাখার ৫০ বছর পূর্তি উৎসব

মোলবনায় মোহন চট্টোপাধ্যায়, অনিমেষ মুখোপাধ্যায়, অদ্বৈতচরণ দত্ত ও ডাঃ সুভাষ সরকার (বাঁ দিক থেকে)।

সঞ্জয় বারুই॥ গত ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলার মোলবনা শাখার ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসব পালিত হলো। এই শাখায় অনেক স্মৃতি ও স্পর্শ আছে— প্রয়াত ডাঃ সুজিত ধর, প্রয়াত মনোমোহন রায়, প্রয়াত শ্যামমোহন দে সহ অনেক বিদগ্ধ গুণী কার্যকর্তার। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বিকাল ৪টায় মোলবনা শিবমন্দির প্রাঙ্গণ থেকে ঘোষ বাদ্য সহকারে পথ সঞ্চলনের মাধ্যমে। পথ সঞ্চলনের সময় গ্রামবাসী মা ও বোনেরা স্বয়ংসেবকদের উপর পুষ্প বর্ষণ এবং শঙ্খ ও উলুধ্বনির মাধ্যমে অভিনন্দন জানায়।

সঙ্ঘস্থানে ধবজোত্তলনের পর হয় সভাপতি ও অতিথি বরণ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কেঞ্জাকুড়া মোলবনা উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিমেষ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত। সভায় বাঁকুড়া জেলা সংঘচালক ও সহ সংঘচালক যথাক্রমে মোহন চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ সুভাষ সরকার উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বালক ও তরুণ স্বয়ংসেবকদের সূর্যনমস্কার, ব্যায়ামযোগ, আসন ও লাঠি খেলার কার্যক্রমের প্রদর্শন হয়। সমবেত গীতের পর মোলবনা শাখার পূর্ব ইতিহাস অবগত করান মোলবনারই বরিষ্ঠ স্বয়ংসেবক এবং বর্তমান ভারতীয় কিষাণ সংঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সমিতির সদস্য অজিত বারিক।

শাখার মাঠে স্বয়ংসেবকদের শারীরিক কসরত।

প্রাস্তাবিক বক্তব্য রাখেন অদ্বৈত দত্ত। বিগত ৮৭ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কী কাজ করে চলেছে তা উপস্থাপন করে তিনি বলেন, বিভিন্ন বহিরাগত বিদেশী শক্তি ভারতকে গ্রাস করতে চাইছে এবং মিশনারীরা সেবার আড়ালে ভারতের মানুষকে ধর্মান্তর করছে। তাই আমাদের হিন্দু সংগঠনের কাজের প্রসার ঘটাতে হবে। সঙ্ঘের শাখায় দেশপ্রেমিক, চরিত্রবান, সমাজ সচেতন মানুষ তৈরি হয়। ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় প্রতিটি ব্লকে সঙ্ঘের শাখাকে ছড়িয়ে দেওয়ার তিনি ডাক দেন। হিন্দুত্ব কী তা নানা উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরে তিনি বলেন, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্— সারা বিশ্ব আমার আত্মীয়— এই ভাবনা সমাজের মধ্যে গড়ে তুলতে চাই।

সবশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন, আর এস এস কোনও সাম্প্রদায়িক সংগঠন নয়, এটি জাতি, দেশ তথা ব্যক্তি নির্মাণের সংগঠন। এই সংগঠনের প্রসার ঘটুক তিনি এই কামনা করেন।

সঙ্ঘের নিজস্ব বেশে ঘোষসহ পথসঞ্চলনে যোগদানকারী স্বয়ংসেবক সংখ্যা ছিল ৬৮ জন। গণবেশ ব্যতীত স্বয়ংসেবক সংখ্যা ১০২। এছাড়া ১৫০ জন নাগরিক এবং ২০০ জন মা ও বোনেরা উপস্থিত ছিলেন।

মোলবনা শাখার মতো মোলবোনা শাখার কার্যালয়ও বেশ পুরানো। স্বয়ংসেবকেরা নিজেদের হাতেই এই কার্যালয়টি গড়ে তুলেছেন। ২০১৩-র জানুয়ারিতে বিবেকানন্দ যুব শিবিরে কমপক্ষে ৫০ জন স্বয়ংসেবক মোলবনা শাখা থেকে অংশগ্রহণ করবে— পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উৎসবে এই শাখার এটাই ছিল সংকল্প।

অন্য রকম

মহিষ র‍্যাম্প শো

হোশিয়ার সিংয়ের সঙ্গে ধন্যরাণী।

নরেন্দ্রর সঙ্গে গোলু।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ‘র‍্যাম্প ওয়াক’ জিনিসটাকে আদৌ ভাল চোখে দেখার কথা ভাবতেই পারেন না রুচিশীল, সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। কিন্তু হরিয়ানার মানুষ অতি সম্প্রতি সাক্ষী হয়ে রইলেন এক অন্য র‍্যাম্প শো’-এর। হরিয়ানার জিন্দে রাজ্য পশু দপ্তরের উদ্যোগে র‍্যাম্পে হাঁটল সারা রাজ্য থেকে আসা ত্রিশটি মোষ। অর্জুন স্টেডিয়ামে আয়োজিত ‘মহিষ র‍্যাম্প শো’-তে তাদের মালিকদের জন্য মোষেরা প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আদায় করেছে পশু উন্নয়ন দপ্তরের কাছ থেকে। এতে অবশ্য সরকারি দপ্তরটির কর্তা-ব্যক্তিদের বিন্দুমাত্র হা-হুতাশ নেই। বরং দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ কে এস ডাঙ্গি জানালেন, “আমরা এই বার্তাই দিতে চেয়েছিলাম যে হরিয়ানার মহিষেরা ভারতের দুগ্ধ উৎপাদনে সেরা।” এই বার্তা যে তাঁরা সফলভাবেই দিতে পেরেছেন তা বলাই বাহুল্য।

উপস্থিত দর্শকরা মোহিত হয়েছেন সেরা আকৃতির, সেরা দেখতে এবং সেরা পারফর্মিং (দুধ দেওয়ার ক্ষমতার ভিত্তিতে) গবাদি পশুর নিকষ কালো যেন পাথরে খোদাই করা গবাদি পশুর মূর্তিগুলিকে দেখে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মহিষগুলি রাজ্যের মধ্যে নিঃসন্দেহে সেরা। বছরভর বহু প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছে এগুলো। যেমন ধরা যাক গোলুর কথা। গোলু জাতিতে ষাঁড় অর্থাৎ পুরুষ এবং বহুবার ‘জাতীয় জীবনদায়ী প্রদর্শনী’-তে জয়লাভ করেছে। যে প্রদর্শনীতে বিচারকদের বিচার্য ছিল গবাদি পশুর বলিষ্ঠতা যেমন, সতর্কতা, স্থূলকায় ঘাড় এবং অণ্ডকোষের আকৃতি। গোলুর মালিক নরেন্দর থাকেন পাণিপথের দিদওয়ারি গ্রামে। প্রতিবছর এই ষাড়টি থেকে তাঁর আয় নেহাত কম নয়, প্রায় ৫-৭ লক্ষ টাকা। একইসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় ধান্যরাণীর কথা। রাণীর মতোই হাব-ভাব এই গবাদি পশুটির। আসলে দেখতে অসাধারণ সুন্দরী সে। ‘হরিয়ানার বিউটি কুইন’ হিসেবে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিচিতি তার। হরিয়ানায় রাজ্য-স্তরের ‘মহিষ সুন্দরী প্রতিযোগিতা’য় ২০০৯ থেকে টানা চার-চারবার বিজয়ী সে। ধন্যরাণীর মালিক হিসারের সিংওয়ান গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হোশিয়ার সিং। র‍্যাম্পে সে এসেছিল রীতিমতো ত্বক পরিচর্যা করে— এক সপ্তাহ ধরে তেল মেখে, চুলে শ্যাম্পু করে পরিপাটী করে আঁচড়ে, সেইসঙ্গে মুখে লাল বেল্ট পরে এবং গলায় এতদিন ধরে জেতা মেডেলগুলো ঝুলিয়ে।

দু’ঘন্টার র‍্যাম্পে হাঁটায় সাক্ষী ছিলেন বাইশ হাজারেরও বেশি কৃষক। ৮০ ফুট বাই ৮ ফুট র‍্যাম্পে ২ মিনিট তাদের মালিকদের সঙ্গে হেঁটে দেখায় মহিষগুলি। এমনিতে মহিষের দাম খুব বেশি। গড়ে যে মোষগুলি প্রতিদিন ১৫ কিলো দুধ দেয় তার দাম ৯০,০০০ টাকা (অর্থাৎ ১ কিলো দুগ্ধোৎপাদনের মূল্য ৬,০০০ টাকা!) কিন্তু এর কোনও ধরা-বাঁধা দামও হয় না। যেমন ধান্যরাণী দিনে ২৩ কিলো দুধ দেয়, তার দাম ১৫ লক্ষ টাকা। ডঃ কে এস ডাঙ্গি বলছেন, “আমরা কৃষকদের বোঝাতে চাই যে ডেয়ারী শিল্প একটি যুগোপযোগী জীবিকা।” আর আমাদের কর্তব্য শুধুই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা।

শোক-সংবাদ

বসিরহাট জেলার কাউগাছি শাখার স্বয়ংসেবক জয়প্রকাশ অধিকারী ৩৫ বছর বয়সে দীর্ঘদিন রোগ-ভোগের পর ১৯ এপ্রিল সকালে সাধনোচিতধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর মা, স্ত্রী, তিন কন্যা ও তিন ভাই বর্তমান।

***

গত ২৪ এপ্রিল বসিরহাট নিবাসী আর এস এসের উত্তর চব্বিশপরগণা বিভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ সুভাষ তরফদারের মাতৃদেবী তরুলতা তরফদার পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর ৩ পুত্র ও ২ কন্যা বর্তমান।

মঙ্গলনিধি

গত ২৫ মার্চ মেদিনীপুর শহরের স্বয়ংসেবক অমিত কুমার দাশের কন্যা অনিন্দিতা দাশের ১৩তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত মঙ্গলনিধির অনুষ্ঠানে মেদিনীপুরের সঙ্ঘচালক চন্দনকান্তি ভুইয়াঁর হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন অমিত দাশের পিতা সন্তোষ কুমার দাশ।

যোগে রোগ মুক্তি

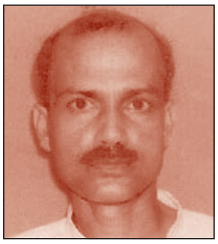

আশীষ পাল

অর্শ (Piles)

মলদ্বারের বাইরের অথবা ভিতরের চারপাশের শিরাগুলি স্ফীত ও প্রসারিত হয়ে মটরদানার আকার ধারণ করে, একেই বলে অর্শ। স্ফীত শিরাগুলিকে বলে 'বলি'। বলি তিন প্রকার— (১) মলদ্বারের আকুঞ্চক পেশীর বাইরের দিকে বহির্বলি (External Piles)। এতে ক্ষত অথবা রক্তস্রাব হয় না। (২) মলদ্বারের এক থেকে দুই ইঞ্চি ভিতরে-শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত থাকে, তাকে অন্তর্বলি (enternal piles) বলে। এর থেকে রক্তস্রাব হয়। (৩) মিশ্রিত বলি (Mixed Piles)।

অর্শের কারণ : যকৃতে রক্ত অধিক, পুরানো কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অতিরিক্ত কোঁৎ (আওয়াজ) দেওয়া, অতিরিক্ত ঝাল, মশলা, গুরুপাক খাদ্য খাওয়া, নিয়মিত রাত্রি জাগা, বংশগত দোষ।

লক্ষণ : মলদ্বারে ব্যথা হয়, জ্বালা করে, চুলকায় ও রক্ত পড়ে। এইসব লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে রোগটা অর্শ।

মুক্তি পাওয়ার উপায় : প্রথমত, রোগীকে পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। যেমন, সকালে রোগীকে ১-২ গ্লাস জল খেতে হবে, সহজ বস্তিক্রিয়া করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করা। যদি অসহ্য হয় ত্রিফলার জল পান সকালে বাসি পেটে বা রাত্রে ইসবগুলের ভুষি খেতে হবে যাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে।

অর্ধস্থাসন : আইনীমুদ্রা পবনমুক্তাসন ও অগ্নিসার ধৌতি। এছাড়া ৫-১০ মিনিট করে Hip Bath মিলে উপকার পাবেন।

অর্ধকূর্মাসন : হাঁটু মুড়ে বসে দু-হাত আস্তে আস্তে মাথার ওপর তুলুন।

নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু জোড়া করে সামনে ঝুঁকে কপাল মাটিতে ঠেকান। দু—হাতের তালু জোড়া থাকবে। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। মনে মনে কুড়ি গোণা পর্যন্ত ওইভাবে থাকুন।

অশ্বিনীমুদ্রা : বারবার মলদ্বার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করাকে অশ্বিনী মুদ্রা বলে। যে কোনও আসনে বসে করা যায়। অবস্থান করার সময় মলদ্বারকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করবেন ও পরক্ষণেই প্রসারিত করবেন, এইভাবে একবার সঙ্কুচিত ও একবার প্রসারিতকে ১ মাত্রা ধরে পর পর ৬ মাত্রা করার পর উক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে একটু বিশ্রাম নেবেন এবং পুনরায় অনুরূপ ভাবে একই প্রক্রিয়ায় আবার এই মুদ্রাটি অভ্যাস করবেন। এই ভাবে মোট ৬ বার অভ্যাস করুন। শ্বাস প্রশ্বাস সহজ ও স্বাভাবিক রেখে করা।

পবনমুক্তাসন : চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। তারপর ডান পা হাঁটু থেকে মুড়ে দু-হাত দিয়ে পেট ও বুকের সঙ্গে চেপে ধরুন। মনে মনে কুড়ি গোণা পর্যন্ত থাকুন, বাঁ পা সোজা একই ভাবে থাকবে। পরে ডান পা সোজা রেখে বাঁ পা এবং পরে দুই পা পেটের সঙ্গে চেপে ধরুন। এই হলো একবার। এইভাবে দু'বার অভ্যাস করুন।

অগ্নিসার ধৌতি : সুখাসনে/পদ্মাসনে বসুন। এবার শ্বাস সম্পূর্ণ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে পেটের নিম্নভাগ (তলপেট অর্থাৎ নাভির নিচের অংশ) যতদূর সম্ভব ভেতরের দিকে টেনে আসুন এবং পরক্ষণেই তলপেটটা শিথিল করুন। এই ভাবে পরপর ছয়বার তলপেটটা টানা ও ছাড়ার পর একটু বিশ্রাম নিন। লক্ষ্য রাখবেন এই অবস্থায় দম যেন বন্ধ থাকে। এইভাবে ৬ বার করা। পরে মাত্রা বাড়ানো।

এছাড়া যারা অর্শরোগে খুব কষ্ট পাচ্ছেন তারা নিয়মিত ৫-১০ মিনিট Hip Bath (কটিস্নান) নিলে উপকার পাবেন। কটিস্নান হলো একটি পলিথিনের গামলা নিন। পরিমাণমতো জল গরম করে গামলার মধ্যে ঢালুন। তারপর একটা তোয়ালে/গামছা পরে পলিথিনের গামলার মধ্যে নিতম্ব ডুবিয়ে বসুন। ১০ মিনিট জলের উষ্ণতা যাতে একই রকম থাকে তার জন্য আলাদা পাত্রে গরম জল করে রাখুন এবং দুই তিন মিনিট অন্তর গামলার মধ্যে গরম জল ঢালুন। এই ভাবে Hip Bath নিলে উপকার পাবেন। কয়েকদিন উপরিউক্ত আসন ও মুদ্রা অভ্যাস করলে দূষিত যকৃত রোগ মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্শ রোগ স্থায়ীভাবে নিরাময় হবে।

অর্শ রোগীর পথ্য হিসাবে কাঁচা অথবা পাকা পেঁপে, পটল, ওল, ডুমুর, কচু, চালকুমড়া, পুঁই, টাটকা শাকসবজি নিয়মিত ভোজন, লেবুর সরবত বেশি পরিমাণে খাওয়া, ঘৃত, মাখন, কাঁচকলা, থোড়, মোচা, এঁচোড় ইত্যাদি অর্শরোগীর খাওয়া ক্ষতিকর।

খেলা

ইউরো কাপে এবার স্পেন কি করবে?

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

চার বছর ধরে ইউরোপ তথা বিশ্ব ফুটবলে রাজ করে বেড়িয়েছে স্পেন। ২০০৮-এ ইউরো কাপ দিয়ে শুরু। তারপর এক এক করে কনফেডারেশন কাপ, বিশ্বকাপ সর্বত্র স্প্যানিশ আর্মাডা দুর্বার গতিতে এগিয়ে গেছে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা, বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে। পাশাপাশি স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনা ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বিরাজ করেছে। বিশ্বক্লাব কাপও জিতে নিয়েছে বার্সেলোনা। এবার বোধহয় স্পেনের অশ্বমেধের ঘোড়ার খানিকটা চাপে পড়ে গতি মন্থর হয়েছে। সম্প্রতি ইউরোপে একাধিক প্রীতি ম্যাচে স্পেন আটকে গেছে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর দেশের কাছে। আর চ্যাম্পিয়ানস লিগে বার্সেলোনা সেমি ফাইনালেই বিদায় নিল চেলসির কাছে হেরে।

আসলে স্পেনের ফুটবলের যে ঘরানা অর্থাৎ পাসিং ফুটবল, দ্রুতলয়ে জায়গা পরিবর্তন সহযোগে, তা আটকাবার জন্য ইউরোপের কোচেরা ক্যাটানেচিও বা সুইস বোল্ট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে সফল হচ্ছেন। অর্থাৎ নিজেদের ডিপ ডিফেন্সে ৭/৮ জনকে নামিয়ে এনে কড়া ম্যান মার্কিং, প্রয়োজনে জোনাল ডাবল কভারিং করে স্পেনের আক্রমণকে ভোঁতা করে দেওয়া। স্পেনের জাতীয় কোচ কি বার্সেলোনার কোচ ওয়ান টাচ ওয়াল বা স্কোয়ার খেলে বিপক্ষের গোল মুখ খুলে ফেলে গোল তুলে আনার ট্যাকটিক্স অনুসরণ করে চলেন প্রতি ম্যাচে। কিন্তু কড়া ম্যান মার্কিং ও টাইট ডিফেন্স ভাঙতে মাঠটাকে বড় করে প্রয়োজনে দুটো উইং ব্যবহার করে খেললে সুফল পাওয়া যায়। এবার স্প্যানিস কোচেদের বিকল্প ট্যাকটিক্স ও স্ট্র্যাটেজি নিয়ে খেলে দেখার সময় এসেছে। না হলে আসন্ন ইউরো কাপে স্পেন কিন্তু খেতাব ধরে রাখতে পারবে না।

এবার ইউরো কাপ হচ্ছে পোল্যান্ড, ইউক্রেনে। গোটা জুন মাসটা বিশ্বজুড়ে মানুষ মোহিত হয়ে দেখবেন ইউরো কাপ। নতুন কোনও স্টাইল বা ট্যাকটিক্স উঠে আসবে ইউরোপের ধুরন্ধর কোচ বা ম্যানেজারদের মাথা থেকে। বিশ্বফুটবলে যা কিছু নতুন আবিষ্কার, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত অথচ নান্দনিক প্রয়োগ শৈলী, তা কিন্তু ইউরো কাপ থেকেই বেরিয়ে আসে। পরে তা বিশ্বকাপে দেখা যায়, অন্য মহাদেশের দলগুলোর খেলায়। তবে প্রকৃত স্কিল, প্রেস বা নন্দনতাত্ত্বিক ফুটবল কিন্তু লাতিন আমেরিকার দলগুলোর কাছেই পাওয়া যায়। কিন্তু টেকনিক, নতুন নতুন স্ট্র্যাটেজি যা এককথায় ঘরানার অদলবদল তা ইউরোপের ফুটবল থেকেই বেরিয়ে আসে। তাই ইউরো কাপ বিশ্বকাপের থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।

২০১০ বিশ্বকাপের পর বিশ্বফুটবল গত দু-বছরে কতটা এগিয়েছে তা দেখা যাবে ইউরো কাপে। স্পেন ছাড়াও ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড হল্যান্ড সাম্প্রতিককালে চমকপ্রদ খেলেছে, অসাধারণ কিছু জয় পেয়েছে প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপ বা প্রীতি ম্যাচে। ২০০০-র পর ফ্রান্স এবার ইউরো কাপে অন্যতম ফেভারিট। ১৯৯৮-র বিশ্বকাপ, তারপর ২০০০-এর ইউরো ব্যাক টু ব্যাক জিতে ফ্রান্স নিজেদের খেলাকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেয়েছিল। এই দাপট চলেছিল চার-পাঁচ বছর ধরে। অনেকটা একই ধারা লক্ষ্য করা গেছে স্পেনের ফুটবলে। আর এই দুই দেশের চমকপ্রদ উত্থানের মধ্যেও স্বতন্ত্র ও আত্মপ্রত্যয়ী ফুটবল খেলে গেছে জার্মানি, হল্যান্ড। ইউরোপে বিশ্বফুটবলে সবচেয়ে ধারাবাহিক দলটির নাম জার্মানি। প্রত্যেকটি বিশ্বকাপ ও ইউরো-তে জার্মানি অন্তত সেমিফাইনাল পর্যন্ত যাবেই। চ্যাম্পিয়নও হয়েছে একাধিকবার।

একই কথা প্রযোজ্য হল্যান্ডের সম্পর্কে। হয়ত ধারাবাহিকতায় খানিকটা পিছিয়ে জার্মানির তুলনায়। কিন্তু বিশ্ব ফুটবলে নানা সময়ে বৈচিত্র্য ও মাত্রাকে সমৃদ্ধ করেছে ডাচরা। টোটাল ফুটবলের জন্মদাতা হল্যান্ড। এখন বিশ্বজুড়ে এই টোটাল ফুটবলই খেলা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ ও মাত্রায়। সেই হিসেবে হল্যান্ড আধুনিক ফুটবলে ল্যাবরেটরি হিসেবে স্বীকৃত। হল্যান্ড এযাবৎ তিনবার বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছে, একবারও কাপ জেতেনি। ইউরো কাপ ১৯৮৮-তে পেয়েছিল। তারপর একবার ফাইনালে উঠে রানার্স হয়েছে। এবার সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাবে কাপ ঘরে তোলার জন্য। ইংল্যান্ড, ইতালি, পর্তুগালও বড়শক্তি। ইতালি বিশ্বফুটবলে ব্রাজিল, জার্মানির মতো বড় শক্তি। ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্য দুই হিসেবেই ইতালি অত্যন্ত সম্ভ্রম আদায়কারী দল।

গত বিশ্বকাপের পর অনেক তরুণ খেলোয়াড়কে দলে নেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের সংমিশ্রণে ইতালি এমন একটি দল, যাকে উপেক্ষা করার কোনও জায়গা নেই। ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, রাশিয়া, সুইডেন, ডেনমার্কও নজরকাড়া ফুটবল খেলবে। তবে এই দলগুলি বড় বেশি ব্যক্তিনির্ভর, চ্যাম্পিয়নশিপের দাবিদার নয়।

শব্দরূপ-৬২৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

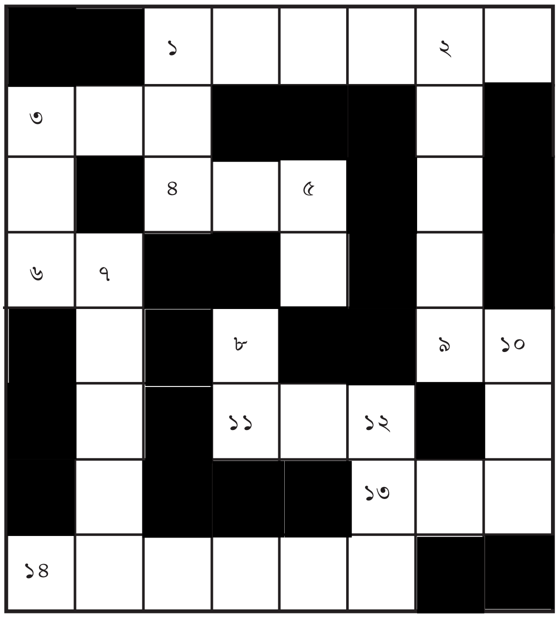

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** ভুবনেশ্বর তীর্থের প্রাচীন নামান্তর; শেষ তিনে অরণ্য, **৩.** স্ত্রী জাতীয় বকপক্ষী; বকী, **৪.** শসা, ক্ষীরা, **৬.** "বনে থাকে—, গাছে থাকে পাখি", **৯.** আগুন জ্বালার শব্দ ('—করে জ্বলে ওঠা') **১১.** কুবেরের আকাশগামী রথ, **১৩.** লক্ষ্মীপতি, নারায়ণ, **১৪.** অকর্মণ্য, মূর্খ (মূল অর্থে, অকালে জাত কুম্মাণ্ডের তুল্য)।

উপর-নীচ : **১.** কালী; মনসাদেবী, **২.** নদীয়াচন্দ্র শ্রীগৌরচন্দ্র, **৩.** পুরাণোক্ত অগ্নিমুখী সমুদ্র ঘোটকী, **৫.** মেখলা, কটিভূষণ/দাক্ষিণাত্যের নগরবিশেষ, অধুনা কাঞ্জিভরম, **৭.** ঘামাচি, **৮.** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট কল্পনাপ্রবণ শিশুচরিত্র, **১০.** "এসেছে শরৎ, হিমের—লেগেছে হাওয়ার পরে" **১২.** ফুলের সাজি, ঝাঁপি।

সমাধান
শব্দরূপ-৬২২
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

		প	ত	ঞ্জ	লি		ল
গো	গো	ল			ভা		হ
	লো		ক		র	স	না
	ক	ল	ঙ্ক			মা	
	ধা			উ	দ্ধ	ব	
য	ম	ক		মা		র্ত	
মু		লে			হ	ন	ন
না		রা	জ	সূ	য়		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬২২ সংখ্যার সমাধান আগামী ৬ জুন, ২০১২ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে "চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী।

উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),F.W.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা—
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা ।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ ।। ২২

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

কলকাতায় আচার্য বিষ্ণুকান্তশাস্ত্রী স্মৃতি ব্যাখ্যানমালা

মঞ্চে রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) মহাবীর বাজাজ, প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী, ডঃ দেবেন্দ্র দীপক, ডঃ রামেশ্বর মিশ্র, যুগলকিশোর জৈথলিয়া। — ছবি : বাসুদেব পাল

সিংহাসন পর বৈঠে লেকে সাধুমন
রাজভবন বন গয়া তপোবন।।

এই দুটি লাইনে প্রয়াত মনীষী, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী সম্পর্কে বললেন মধ্যপ্রদেশ সাহিত্য একাডেমির প্রাক্তন নির্দেশক ডঃ দেবেন্দ্র দীপক।

বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় কর্তৃক আয়োজিত আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী স্মৃতি ব্যাখ্যানমালায় এই সপ্তম আয়োজনের বিষয় ছিল ''সন্তদের জীবনদৃষ্টি এবং বর্তমান সময়।''

ডঃ দীপক তাঁর প্রায় একঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ বক্তৃতায় অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে চলমান রাষ্ট্রজীবনের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, এসময়ে দেশসেবার নাটক চলছে— এক হিন্দুস্থানের ভিতর অনেক হিন্দুস্থান। সংবিধানের মধ্যেকার হিন্দুস্থান আর বাইরের হিন্দুস্থান-এ বিস্তর ফারাক। দেশ এখন রামপুরী চাকু, সন্ত্রাসবাদী ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের হিন্দুস্থানে পরিণত হয়েছে। দুধ ঘি থেকে নোট, শিক্ষা সবকিছুই নকল। নকলই সবচেয়ে বড় সত্য।

সমাজ ভস্মরোগে পীড়িত। প্রশাসক, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক এবং মাফিয়ারাই সর্বেসর্বা। সমাজ হয়েছে ভৌতিকতাবাদী। ডঃ দীপক কবীর, তুলসী দাস, রসখান, রবিদাস, রামানন্দ প্রভৃতি সন্তদের জীবনবোধ প্রসঙ্গসহ ব্যাখ্যা করেন। তিনি ধর্মান্তরকরণের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, জাত-পাত, ক্ষুধা, অশিক্ষা, রোগ-পীড়া থেকে মুক্ত সমাজের যে কল্পনা সাধু-সন্তরা কামনা করে গেছেন তাই আমাদের সবার কাম্য হওয়া উচিত।

গত ৬ মে সকালে মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশ্বভারতী'র অধ্যাপক ডঃ রামেশ্বর মিশ্র। আলোচনাসভার সূত্রপাত করেন ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী এবং ধন্যবাদ জানান প্রবীণ সমাজসেবী যুগলকিশোর জৈথেলিয়া। সভার শুরুতে মঞ্চস্থ সকলে প্রয়াত বিষ্ণুজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় সম্মানিত

কলকাতার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সুতানটি পরিষদ' এবং 'হিন্দুস্থান আর্ট অ্যান্ড মিউজিক সোসাইটি'র যৌথ উদ্যোগে এক ব্যাতিক্রমী অনুষ্ঠান হয়ে গেল শোভাবাজার রাজবাড়িতে। এ উদ্যোগের অন্যতম কর্ণধার প্রসেনজিৎ পোদ্দারের বক্তব্য, সমাজের বিভিন্নক্ষেত্রে বিশেষত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সাধনাকে সম্মান জানানোর জন্য এই আয়োজন। একই সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সামাজিক কার্যকর্তা সম্মানে ভূষিত করা হয়।

এবারে সামাজিক কার্যকর্তা হিসাবে সম্মানিত হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের প্রচারক অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়। গত ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় শ্রী চট্টোপাধ্যায়কে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়।

অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
14 May - 2012

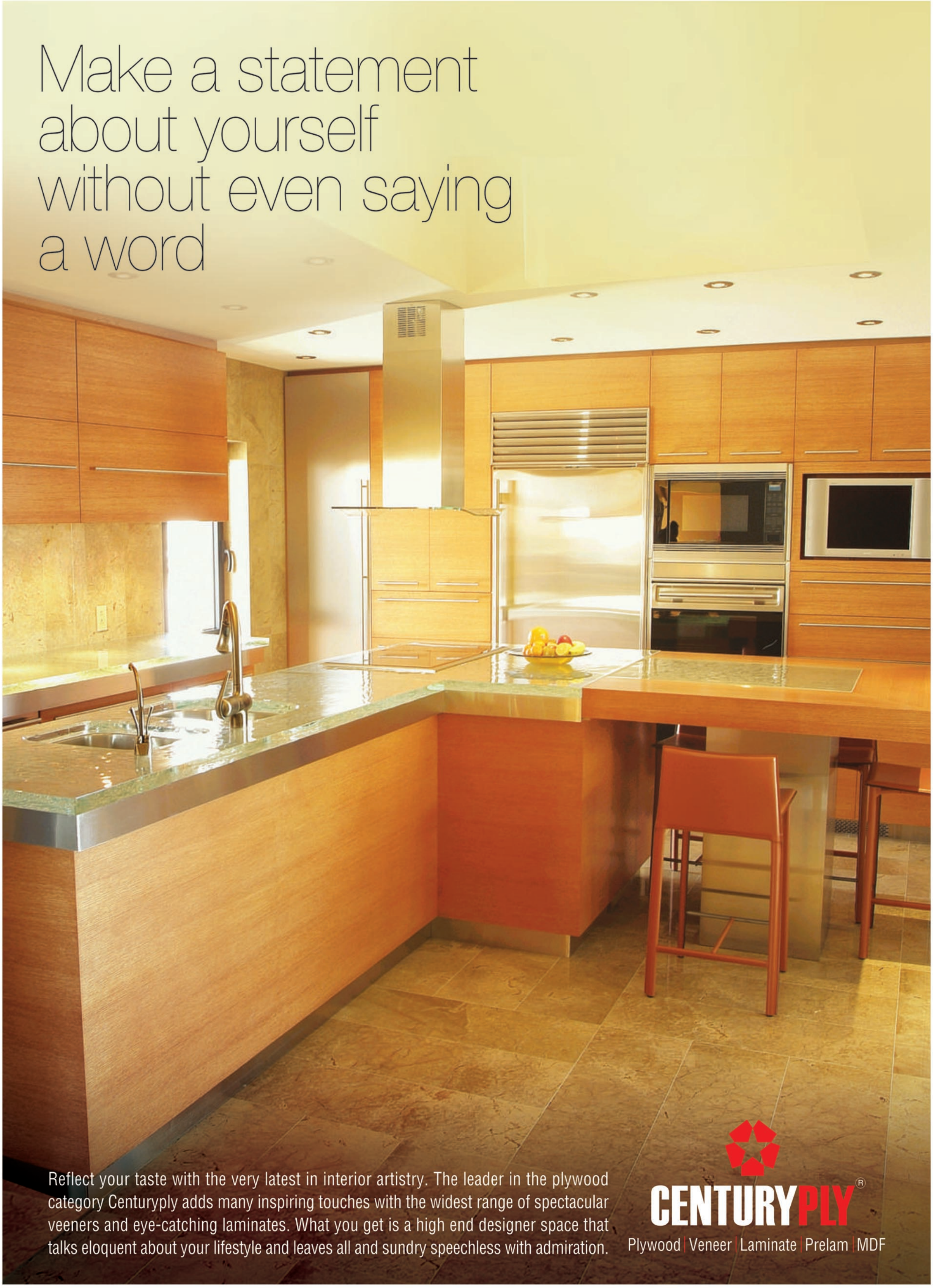

দাম : ৭.০০ টাকা